তারানাথ তান্ত্রিক

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি ? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোননি ? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি ? যা বলে তা সত্যি হয় ? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে ? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে ? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ির গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি। আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন। বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে।

দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ি।

হাসিয়া বললাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত তার এই বাড়ি ?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে ?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষীমশায় বাড়ি আছেন ?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোনো উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন ?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক ? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক ? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে এরকম তো দেখিনি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটা গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তবে তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোনো অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন

আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মানিব্যাগটা খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধহয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে ? এটুকু বোধহয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন বুঝে শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোরদৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ির ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণমাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পস্‌ার নষ্ট হইল। তবু ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনোটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমথ হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই ?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাইনি

এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনোদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন, দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।' তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোনো একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা সুতরাং—হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিকশক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবু এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোনো মূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে contact at a distance-এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজ্‌ম্, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার

উপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবু তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাকম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান ? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ি এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম- চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছ আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামতো নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম—সব দিন ঘটে উঠত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাসতিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির, মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টেকে না। ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু তো কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন— বাবাজীর বাড়ি কোথায় ?

আমি বললাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর ? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান ?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ি-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনিনি ! সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি ক'রে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো ?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্ কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোনো পূর্বপুরুষ, ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা জানেন দেখছি ?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোনো ছেলেমানুষির কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস্ কেন ? ধর্মকর্ম করবি বলে ?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম কিছু করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন ? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ি যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি করে জানলেন বলবেন না ? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস্ ?

আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোনো লাভ হবে না।

তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোনো হদিশ মেলাতে পারলুম না। সান্ন্যালদের বাড়ির ছেলে-ছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ি এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমার বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেননি। অন্তত দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন ?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড় বড় কিস্তি চলত। কোনো নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট ?

তিনি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল ? বই-টই লিখছ না কি ?

ওদের কাছে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোনো অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে. সে আসলে খব বড

তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে ?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার উপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি।

আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি ?

বললাম, মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস্ তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। এ এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে না রে ? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ওমা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে। পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়াকাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরীয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে ? তুমিই তো আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর মুণ্ড চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন

খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্ বল্ তো ? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি ? আমার এখানে যখন এসেছিস, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার? বল কি খাবি ?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতার গন্ধবাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য ব'লে মনে হয়নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি তো অবাক্! ইতস্তত করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি এরক রকম অসম্বন্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছে শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসিহাসি মুখে বলছে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক্, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে না কি ?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন। বললে— আবার

এসেছিস দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই ?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে ? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি ?

পাগলী বললে—পারবি তুই ? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি ? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি। ভোর রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যে হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী ?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন ?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন ? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা ? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে। ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস্ কেন রে, ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া ? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হৌসে চাকরি কর্ গিয়ে—বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে ?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম,

তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকেও ওবেলা গালাগাল দিয়েছি, কিছু মনে করিস নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা করতে চাস্ নি। ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয় ? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক্ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনোদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা !

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া ব'লে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহ'লে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না ? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর

মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে ?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপ্‌সা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল ? যাই কি না যাই ?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন ?

মেয়েটি হেসে বললে, কে ?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বলল—আ মরণ, কে তার নামটাই বল না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি ?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বললে—এসো না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি ? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এসো—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে হ'ল না— তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোনো বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এসো, ব'স।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি ?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোনো ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর্। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোনো কালেই, তবু কখনও মড়ার উপর ব'সে সাধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এসো।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধহয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হাল্‌কা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না ; অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোনো তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র

আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোনো বিভাষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোনো দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকার দিগবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে কোনো স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে আমার মনে হ'ল শ্মশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্‌রা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি ! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয় নি—পর্‌ক্ষণে আমার চারপাশে মেয়েগলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।.... আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনোটার মাথার খুলি ফুটো, কোনোটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই

ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমায় গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে ? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না ?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি.....বললাম-আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন....আমার জীবন ধন্য হ'ল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন ?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েছি তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা... তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর ক'রে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন ?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে ?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।....যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না ? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোন নি তন্ত্রে ? পাষণ্ডদলনের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড ?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে....অত ভয় কিসের!

তুমি না তোকে লাথি মেরেছি ? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি। তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দিয়েছি তোকে ?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি ?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল!

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোনো তফাত নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস্ কি ?

আমি কথার কোনো উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও না কি ?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কাল হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকেবেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোনো কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনোটার মেরুদণ্ড, কোনোটার কপালের হাড়, কোনোটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবু তাদের নৃত্য সমানেই চলছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের চিৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দুচোখ ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে কি ভীষণ ক্রূর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে। ছাপ্পান্ন বছর.... কাকেই বা বলি ? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে... সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না ?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনায় বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা! তুই তার জানিস্ কি ? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধসুরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না ; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল— কি সেটা ?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস্, তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন ?

তারপরে সে হঠাৎ হি হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কাবরার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই ? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি ? এই তো সবে সন্ধ্যে—!

—আঁ্যা!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা

হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল—ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিলশকুনির ঝাঁক—সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে ? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে ?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম নয়, তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনোদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন ? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন ?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে—এ-জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাইনি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনোদিন।

তখন আমি চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত— তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝবে ? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও ? এসো চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাতত চন্দ্রদর্শন অপেক্ষা গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

মুক্ত করেছ। আমি শুধু উপায় ব'লে দিয়েছি মাত্র। আর একটি কথা—

—ভন্তে, বলুন।

—আমি স্বর্গে তোমাকে নিয়ে যাইনি। এখানে এই বৃক্ষতলে ব'সেই ওই দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি। যখন দেখলাম, তোমার তরুণ চিত্তবৃত্তি নারীতে আসক্ত, তখন সেই পথেই যাতে তুমি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ কর, তার জন্যে ওই একটি অলীক কল্পনার আশ্রয় আমায় নিতে হয়। ওই সব অপ্সরা কোথায় ছিল না, স্বপ্নে দৃষ্ট গন্ধর্বনারীর মতই ওই স্বর্গও অলীক।

তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব

তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনিয়াছেন কিছুদিন আগে, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শুনাইবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

জগতে কি ঘটে না ঘটে তাহার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি? "There are more things in Heaven and Earth, Horatio" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব এই গল্পটি শুনিয়া যান এবং সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া ডিস্‌মিস্‌ করিবার পূর্বে মহাকবির ঐ বহুবার উদ্ধৃত, সর্বজনপরিচিত, অথচ গভীর উক্তিটি স্মরণ করিবেন এই আমার অনুরোধ।

তবে যিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোন সূক্ষ্ম জগৎ, কিংবা ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন অশরীরী জীব কিংবা অপদেবতা-উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নহেন, তিনি এ গল্প না-হয় না-ই পড়িলেন?

ভূমিকা রাখিয়া এখন গল্পটা বলি।

সেদিন হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না, সন্ধ্যার পূর্বে মাঠ হইতে ফুটবল খেলা দেখিয়া ধর্মতলা দিয়া ফিরিতেছিলাম। মোহনবাগান হারিয়া যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না—কি আর করি, ধর্মতলার মোড়ের কাছেই মট্‌ লেনে (নম্বরটা মনে নাই তবে বাড়িটা চিনি) তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি গেলাম।

তারানাথ একাই ছিল। আমায় বলিল—এস, এস হে, দেখা নেই বহুকাল, কি ব্যাপার?

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে ঘোর বৃষ্টি নামিল। তারানাথ আমায় এ অবস্থায় উঠিতে দিল না। আমি দেখিলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামিবে না, তারানাথের বৈঠকখানায় বসিয়া আমরা দু-জনে। বৃষ্টির সময় মনে কেমন এক ধরণের নির্জনতার ভাব আসে—বৃষ্টি না থাকিলে মনে হয় শহরসুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে আসিয়া ভিড় করিবে, কেহ না আসিলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে, কিন্তু বৃষ্টি নামিলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেহই আসিবে না। সুতরাং আমার ঘরে আমি একা। তারানাথের [illegible]ও সেদিন মনে হইল আমরা দু'জনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোন লোক নাই।

সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিল। জীবনের অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল। ঘোর বৃষ্টি-মুখর আষাঢ়-সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়, ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার, চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস্‌-দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্‌ সময় নারীপ্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম।

তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও শুকদেব যে নয় বা কোন কালে ছিল

না, এ-কথা পূর্বের গল্পটিতে বলিয়াছি। আশা করি, তাহা আপনারা ভোলেন নাই। নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহার মুখ হইতেই এ বিষয়ে কিছু রসাল অভিজ্ঞতার কথা শুনিব, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে এ সম্বন্ধে যে অসাধারণ ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল, তাহার জন্য, সত্যই বলিতেছি, আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আর একটা কথা, তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে, অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথা-বার্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই, আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমার কাছে কেন কাহারও কাছে বলে নাই, হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে—কারণ সে-কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করা মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয়, লোককে সে-সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত।

বলিলাম—জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক—কি বলেন?

তারানাথ বলিল—অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার। এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয়—শোনো তবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না, প্রথম প্রেম হ'ল একটি মেয়ের সঙ্গে, সে মারা গেল—এই তো? ও ঢের শুনেছি। তারানাথ হাসিয়া বলিল—ঢের শোন নি! শোন—কিন্তু বিশ্বাস যদি না কর তাও আমায় বলবে। এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্পলেখক হয়ে যেতুম হে !... দু-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া একথা কারও কাছে বলেনি।

ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর হইতে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু-পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলুভাজা আনিল। চারি দশ বছরের মেয়ে, তারানাথের মতই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল, মুখ চোখ মন্দ নয়। আমায় বলিল—কাকাবাবু, লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না? চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম, ধর্মতলার দোকান হইতে তাহার উল-বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নক্‌শা কিনিয়া দিব। বলিলাম—আজ ফুটবলের ভিড় ছিল, কাল এনে দেবো ঠিক।

চারি দাঁড়াইয়া ছিল, তারানাথ বলিল—যা তুই চলে যা, দুটো পান নিয়ে আয়—

মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ছেলেপিলের সামনে সে-সব গল্প—চা-টা খেয়ে নাও, পরোটাখানা—না না, ফেলতে পারবে না, ইয়ং ম্যান তোমরা এখন—খাওয়ার বেলা অমন—ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো—

চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিলঃ

বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলীর অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিলুম, তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরেই।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে। নিজের চোখে যা দেখলুম, তা তো আর বিশ্বাস না ক'রে পারি না। এটা পাগলীর কথা থেকে বুঝেছিলুম, পাগলী আমায় ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল। ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে। গুরু খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজলে কি হবে, ও পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথম, ধুনি-জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার, ধর্ম জিনিসটা এদের

কাছে একটা বেচাকেনার বস্তু, ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা, এদের ঠকানো খুব সহজ, বিশেষতঃ ধর্মের ব্যাপারে।

যাক ও-সব কথা। আমি ধুনি-জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম, ইন্‌সিওরেন্সের দালাল দেখলুম, দৈবী ঔষধের মাদুলি বিক্রেতাকে দেখলুম, সাধুবেশী ভিক্ষুক দেখলুম—সত্যিকার সাধু একটাও দেখলুম না।

এ অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি, শীতকাল, আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ, ঋজু ও দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন। আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী, বললেন—তুই যে দেখছি বড় ভক্ত! কি চাস্ এখানে? বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস।

আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম—রাগ নয় বাবাজী, বৈরাগ্য—

সাধুজী হেসে বললেন, যে কথাটি পাগলীও বলেছিল—ওহে ছোকরা, সাধু হব বললেই হওয়া যায় না। তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। সংসারধর্ম কর্ গে যা।

মন্দির থেকে একটু দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমুণ্ডির আসন—পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরী। সাধু রাত্রে সেখানে নির্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম। মনে ভারী শ্রদ্ধা হ'ল, সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে এবার।

কিছুদিন লেগে রইলাম তাঁর পিছনে। তাঁর হোমের কাঠ ভেঙ্গে এনে দিই, তিন মাইল দূরের কুসুমবনী ব'লে গ্রাম থেকে তাঁর চাল-ডাল কিনে আনি। গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক। অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর আছে। তবে পাগলীর কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল—এখানেও তেমনি ভয় দেখালে। বললে—তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসিদের বিশ্বাস করো না বেশী। ওরা সব পারে, একটু সাবধান হয়ে চলো। বিপদে পড়ে যাবে।

শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেদিন শুক্লপক্ষের রাত্রি, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজী কার সঙ্গে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে কথা বলছেন। কৌতূহল হ'ল—এত রাত্রে কে এল এই নির্জন নদীতীরের জঙ্গলের মধ্যে?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূরে গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

সাধু বাবাজী এত রাত্রে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—গাছের আড়াল থেকে মেয়েমানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হ'ল মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী।

এত রাত্রে গুরুদেব কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, সে মেয়েটি এলই বা কেমন করে একা এই নির্জন জায়গায়?

যাই হোক আর বেশীদূর অগ্রসর হ'লেই ওরা আমায় টের পাবে। মনে কেমন ভয়ও হ'ল, সে দিন চলে এলুম। তার পরদিন রাত্রে আমি ঘুমুলাম না। গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে-মানুষটি আজও এসেছে। ভোর হবার কিছু আগে পর্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফরসা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হ'ল না—মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই।

একদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। যে-মেয়েমানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে

অর পরণের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরণের। সে যে কোন দেশের বস্ত্র পরেছে, সেটা না শাড়ি, না ঘাঘরা, না জাপানী কিমোনো, না মেয়েদের গাউন!—অজানা যদিও, ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে।

সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হ'ল।

মেয়েমানুষটি যেই হোক, সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কি ক'রে আমার একথা মনে হ'ল তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই কথা আব্‌ছা ভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হ'ল।

সরে পড়ি বাবা, দরকার কি আমার এ সবের মধ্যে থেকে?

কিন্তু পরদিন রাত্রে এক সময়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে—উঠে যেতেই হ'ল। সেদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়েমানুষটি যখন থাকে, তখন এক ধরণের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায়—এ ক'দিনও এই গন্ধটা পেয়েছি, কিন্তু ভেবেছিলুম কোনও বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো। আজ বেশ মনে হ'ল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্তমান।

এই রকম চলল আরও দিন-দশ-বারো। তার পরে সাধুর ডাক এল বরাকর না কোডার্মার এক গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়িতে কি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। সাধুজী প্রথমে যেতে রাজী হন নি, দু-দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পাল্কী নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোশামোদ করে নিয়ে গেলেন।

মনে ভাবলুম এ আর কিছু নয়, সাধুজী সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজী নন্।

কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই, মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে? আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয়—আমি অনেকবার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেক বারই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোন বড় ঘরের মেয়ে, যেমন রূপসী, তেমনি তার অদ্ভুত ধরণের অতি চমৎকার এবং দামী পরণ-পরিচ্ছদ।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজীর হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয় নি—দেখাই যাক না আজ রাত্রে আসে কি না? তখন ছিল অল্প বয়েস, তোমরা যাকে বল রোমান্স, তার ইয়ে তখন যে আমার যথেষ্টই ছিল. এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে রইলাম। মনে ভয়ানক কৌতূহল, দেখি আজ মেয়েটি আসে কিনা। কেউ কোন দিকে নেই, নির্জন রাত্রি, মনে একটু ভয়ও হ'ল—এ ধরণের কাজ কখনও করি নি, কোন হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যাই!

তখন আমি অপরিণতবুদ্ধি নির্বোধ যুবক মাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি তবে কি আর ছাতিমতলায় একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে যাই?

তার নয়, ও আমার অদৃষ্টের লিপি। সে রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটে নি। আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্যে হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কালরাত্রে —তা কি আর তখন বুঝেছিলাম!

যাক্ ও-কথা।

রাত ক্রমে গভীর হ'ল। পুব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে। আমার ডাইনেই বরাকর নদী, দুই পাড়েই শিলাখণ্ড ছড়ানো, তার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই নদীর পাড়েই ছাতিমতলা ও পঞ্চমুণ্ডির আসন—আমি যেখানে ব'সে আছি। আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ—তার পর শালবন শুরু হয়েছে।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন

এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে, এমন অতর্কিত ভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাই নি। অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জ্যোৎস্না-ওঠা শিলাবিস্তৃত পাড় আর এক দিকে ফাঁকা মাঠ। আসনে ব'সে পর্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছি—মাঠের দিকে! নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয়—মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আধ সেকেন্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি, আধ সেকেন্ড পরেই সেখানে জলজ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মত ঠেকল ব'লেই আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ! আমার সারা দেহ-মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।...আমার জ্ঞানও বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেন্ড। তার পরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না।

যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়েছে। উঠে দেখি সারা-রাত সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা-রাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা হয়েছে, গলা ভার হয়েছে। উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চ'লে এলাম। এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার মনে হ'ল আমার জ্বর হবে, শরীর এত খারাপ।

পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি।

মেয়েটি কে? কি ক'রে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এল? এ তো একেবারে অসম্ভব। অসামান্য রূপসী যে মেয়েটি, অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্বে ওই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিলুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন, এরও তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না! অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করাও সারাদিন আমার ঘুচল না। বিকেলের দিকে সাধুবাবাজী গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়ি থেকে ফিরলেন। আমার জন্যে লাড্ডু, কচৌড়ি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন—তাঁর নিজের জন্যে জমিদার-বাড়ি থেকে ভাল একখানা পশমী আলোয়ান দিয়েছে!

আমায় বললেন—শুয়ে কেন? ওঠ—জিনিসগুলো রেখে দাও—

অতিকষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুঁটুলিটা নিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হয়েছে?...অসুখ-বিসুখ নাকি?

কিছু জবাব দিলাম না।

সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার-বাড়ির কাণ্ড কি রকম তারই সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমায় বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো? অমন মনমরা ভাব কেন? বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? বলেছি তো বাবা, তোমরা ছেলে-ছোকরা এ-পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু! বড় কঠিন পথ।

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কত দিন ঠিক জানি না—অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম। জ্ঞান হ'লেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন। বোধহয় তাঁরই সেবাযত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম।

সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে, সাধু বললেন—ছেলেছোকরা কিনা, কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছিলে বাপু? এবার তো বাঁচতে না—অতিকষ্টে বাঁচাতে হয়েছে। আচ্ছা বাপু, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে?

আমি তো অবাক। কি ক'রে জানলেন ইনি? আমি তো কোন কথাই বলি নি। হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল, সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে, সে-ই ব'লেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—ভাবছ আমি কি ক'রে জানলাম, না?... আরে বাপু, কতটুকুই বা তোমরা বোঝ, আর কতটুকুই বা তোমরা জান। তোমাদের দেখে দয়া হয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি ক'রে?

সাধু হেসে বললেন—আরে পাগল, তুমিই তো জ্বরের ঘোরে বলেছিলে ঐ সব কথা—নইলে জানব কি ক'রে? যাক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের। আর কখনও অমন পাগলামি করতে যেও না।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তা হ'লে আমিই বিকারের ঘোরে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছি!...সেইদিন মনে মনে সংকল্প করলাম দুএক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব—শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই।

কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম। সাধুবাবাজীকে তার পরদিন পাহাড়ী বিচ্ছুতে কামড়াল—তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি, তাঁর সেবা করি, দিনরাত জেগে তিন দিন পরে তাঁকে সারিয়ে তুলি।

দিন-দশেক পরে আমি এক দিন বললুম—সাধুজী আমি আজ চলে যেতে চাই।

সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন—চলে যাবে? কোথায়?

—এখানে থেকেই বা কি হবে? আমার তো কিছু হচ্ছে না—মিছে ব'সে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো। দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে ব'সে নেই?

সাধুজী চুপ ক'রে গেলেন, তখন কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন। বললেন—ভেবেছিলাম এ পথে নামাব না তোমায়। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ, সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ, নিজের ছেলের মত সেবা করেছ, তোমাকে কিছু দিতে চাই। একটা কথা তার আগে বলি, তোমার সাহস বেশ আছে তো?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র-সাধনা ক'রেছি!

তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলি ও তার অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের কথা বললাম—এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলীর কথা বললাম।

সাধু অবাক হয়ে বললেন—সে পাগলীকে তুমি চেন? আরে, সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্বজন্মের পুণ্য। ওর নাম মাতু পাগলী, মাতঙ্গিনী। ও নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক ভাবে সিদ্ধ। ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে! কি সর্বনাশ! ওকে আমরা পর্যন্ত ভয় ক'রে চলি—কি রকম জান? যেমন লোকে ক্ষ্যাপা শেয়াল-কুকুর কি গোখরো সাপকে ভয় করে, তেমনি। ও সেই জাতীয়। অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের। ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত, সে একদিন বলব। কত দিন ওর সঙ্গে ছিলে?

—প্রায় দু-মাস।

সাধুজী বললেন—যখন ওর সঙ্গে ছিলে, তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার। তোমাকে আমি মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার মনের ভাব আমি জানি। তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়েছিলে বল তো?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। মনের গোপনে পাপ নেই, যদি পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে থাকি—তবে সেই অপরিচিতা নিশাবিহারিণী রূপসীর টানে যে, এ-কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে।

সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন।

বললেন—কিন্তু একটা কথা তুমি জান না, সেটা আগে বলি। তুমি সেদিন যাঁকে রাত্রে ছাতিমতলায় ব'সে দেখেছিলে, তিনি তোমার আমার মত দেহধারী মানুষ নন্।

শুনে তো মশাই আমার গা শিউরে উঠল—দেহধারী জীব নয়, বলে কি রে বাবা! তবে কি ভূত-পেত্নী নাকি?

সাধুজী বললেন—তোমায় এ কথা বলতাম না, যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলীর সঙ্গে ছিলে। আচ্ছা শুনে যাও। আমার গুরুদেব ছিলেন ‘কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, হুগলী জেলায় জেজুড় গ্রামে তাঁর মঠ ছিল। মস্ত বড় সাধক ছিলেন, কুলার্ণব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। মহাডামর-তন্ত্রের একটি নিম্ন শাখার নাম

ভূতডামর। আমি তখন যুবক, তোমারই মত বয়েস—স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূতডামরের উপর। গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও-পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাই কি হয়, অদৃষ্টলিপি তবে আর বলেছে কাকে? এই তোমার যেমন—

আমি বললাম—ও-পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

—ও-পথ প্রলোভনের পথ, বিপদের পথ। ভূতডামর তন্ত্র নানাপ্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে—তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী। জপে ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে-কেউ—যার সাধনা তুমি করবে—সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে। নানা ভাবে এদের সাধনা করা যায়, কিঙ্কিণী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয়, কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে—কিন্তু বাকী সব যোগিনীদের যে-কোন ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে-কোন ভাবে পেতে পারা যায়। এই সব যোগিনীদের কেউ ভাল কেউ মন্দ। এঁদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম নেই, কোন গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নন। ভূতডামরে এই সাধনার ব্যাপারে ব'লে দেওয়া আছে। ভূতডামরের প্রথম শ্লোকই হ'ল—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তমম্
সর্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্বসিদ্ধিদম্
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা

তুমি সেদিন যাঁকে দেখেছিলে তিনি এই রকম একজন জীব। তোমার সাহস থাকে সে-মন্ত্র আমি তোমায় দেব। কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন তবে এ-পথে নেমো না।

এতটা বলে সাধুজী ভাল করেন নি, আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামলে রাখতে পারেন? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লাম, মন্ত্র নেবই।

সাধুজী বললেন—তবে কনকবতী দেবী-সাধনার মন্ত্র নাও—কন্যাভাবে পাবে দেবীকে—

আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি আবার বললেন—তবে কিঙ্কিণী-সাধনার মন্ত্র?

আঃ, কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে। অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি?

সাধু আমায় চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন—বেশ, আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী-সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি। এঁকে কন্যা ভাবে, ভগ্নী ভাবে বা ভার্যা ভাবে পেতে পার। তবে আমার যদি কথা শোন, কখনও ভার্যা ভাবে পেতে যেও না। এর বিপদের দিক বলি। ভার্যা ভাবে সাধন করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মত দেখবেন—কিন্তু এঁরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী, সাধারণ মানবী নয়, এঁদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত। হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ ক'রে রাখবে, নয়তো একেবারে উন্মাদ ক'রে ছেড়ে দেবে। সামলাতে পারা বড় কঠিন।

সাধুজী আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন—বাবা, এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে। তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে। এক জায়গায় দু'জন সাধকের সাধনা হয় না।

বেশ ভাল। আমিও তা চাইনে। আমার ভয় ছিল, হয়তো সাধুজীও মাতু পাগলীর মত হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ জানে, এবং খানিকটা অভিভূত ক'রে যা-তা দেখাবে আমায়। তারপর—

আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—কেন, আপনি যে স্বচক্ষে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি মূর্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না?

—তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলি নি? হয়তো পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখন বসে, তখনই জ্বর আসছে, সে-সময় জ্বরের পূর্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব—হয়তো চোখের ধাঁধা। জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি।

যাক সে কথা। তারপর ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জন জায়গায়। ওখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে, থাকতাম

গ্রামের বারোয়ারী ঘরে। গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম, আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম।

এই রকমে একমাস কেটে গেল, দু-মাস গেল, তিন মাস গেল। কিছুই দেখিনে। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। তবুও মনকে বোঝালাম—ছ-মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম ব'লে দিয়েছিল সাধুজী। তার আগে কিছু হবে না। ছ'মাসও পূর্ণ হ'ল। সাধুজী যেমন বলে দিয়েছিল, ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম।

পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্মতম্।
আমিষান্নৈঃ পুপসূপৈঃ সংপূজ্য মধুসুন্দরীম্॥

বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম, কই মাছ পোড়ালুম, আঙট কলার পাতায় ভাত ও পোড়ামাছের নৈবিদ্য দিলাম। ডুমুরের সমিধ দিয়ে বালির উপর হোম করে ওঁ টং ঠং ঝং ঈং ক্ষং মধুসুন্দর্য্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম। জাতিফুলের মালা নিতান্ত দরকার, কত দূর থেকে খুঁজে জাতিফুলের মালা এনেছিলাম—তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন ক'রে ধ্যানে বসলাম—সারারাত কেটে গেল।

বললাম—কিছু দেখলেন?

—কা কস্য পরিবেদনা। ঘি, চন্দন, মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ধ্যান-জপ-হোমে কিছুই ফল ফলল না। রাগ ক'রে টান মেরে সব নৈবিদ্য ফেলে দিলাম নদীর জলে। বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে। কোনো ব্যাটার কোনো ক্ষমতা নেই—যেমন মাতু পাগলী তেমনি এ সাধু। তন্ত্রটন্ত্র সব বাজে, খানিকটা হিপ্নটিজ্ম্ জানে—তার বলে মূর্খ গ্রাম্যলোককে ঠকিয়ে খায়।

এ-সব ভাবি বটে, জপটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি, অভ্যেসমত ক'রেই যাই. ওটা যেন একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ-ভাবে আরও মাস চার-পাঁচ কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরেই। রাত তখন হয়েছে সবে, আধ ঘণ্টাও হয়নি। আমি একটা গাছের তলায় বসে জপ করছি, অন্ধকার হ'লেও খুব ঘন হয় নি তখনও—হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি। যা যা হ'ল একটার পর আর একটা বলছি মন দিয়ে শোন। কস্তুরীর গন্ধটা যখন সেকেণ্ড চার-পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল। ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরীর গন্ধ! বাঃ, পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে!

তারপরেই আমার মনে হ'ল আমার পেছনে অর্থাৎ যে-গাছটার তলায় ব'সে ছিলাম তার গুঁড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না-দেখেও এভাবে ধরা যায়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে মনে হ'ল। আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি? ভয় হ'ল মনে। ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আধ সেকেণ্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না। ঠিক সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করলাম জ্ঞান হারাব না কখনই।

মেয়েটি দেখি ভ্রূকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নিজের চোখে এমনি এক মূর্তি দেখলেন আপনি?

আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলিল—নিজের চোখে। সুস্থ শরীরে। বিশ্বাস কর না-কর সে আলাদা কথা—কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারব না।

—কি রকম দেখলেন? কেমন চেহারা?

—ভারি রূপসী যদি বলি কিছুই বলা হল না। মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যানে আছে।

উদ্যদ্ ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী
নীলাম্বর পরিধানা মদবিহ্বললোচনা

নানালঙ্কারশোভাঢ্যা কস্তুরীগন্ধমোদিতা
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্

অবিকল সেই মূর্তি। তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মনগড়া কথা নয়, সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—আপনি কোন কথা বললেন?

—কথা! আমার চেতনা তখন লোপ পাবার মত হয়েছে—তো কথা বলছি। পাগল তুমি? সে-তেজ সহ্য করা আমার কর্ম? সাধারণ মানবীর মত তার কোন জায়গাই নয়। ঐ যে বলেছে মদবিহ্বললোচনা—ওরে বাবা সে চোখের কি ভাব! ত্রিভুবন জয় হয় সে-চোখের চাউনিতে।...

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—বর্ণনা রাখুন। কি কথা হ'ল বলুন।

—কথাবার্তা যা হয়েছিল সব বলার দরকার নেই।

মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায় দেখা দিতেন। নদীতীরের সেই নির্জন জায়গায় তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়ারূপে—বলাই বাহুল্য, সাধুর কথা কে শোনে? তখন শীতকাল, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিলিগাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে, আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে বালির উপর অভ্রকণা জ্যোৎস্নারাত্রে চক্‌চক্ করে, বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে! আকাশ রোজ নির্মল, রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার বড় মনোরম শোভা—সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতিরাত্রে দেখা দিতেন—সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ঐ তিন মাস। এসব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। কত বেদনাদায়ক তুমি জান না, আমার জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলুম ঐ তিন মাসে। দেবীই বটে, মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালবাসা, অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা—সে এক স্বর্গীয় দান...সে তুমি বুঝবে না, তোমায় কি বোঝাব, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে, মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে। হয়ত ভাবছ এতক্ষণ। তুমি কেন আমার স্ত্রীই আমার কথা বিশ্বাস করে না, আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল ক'রে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে।

কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মত। আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ ক'রে দিতে লাগলো। কিছু ভাল লাগে না। কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শালবনে, কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন! সারারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মত, নেশার ঘোরের মত। আকাশ, নক্ষত্র, দিক-বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্যে—কয়েক প্রহরের জন্যে সময় স্থির হয়ে নিশ্চুই হয়ে স্থাণুর মত অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদীতীরের বনপ্রাঙ্গণে।

একদিন ঘটল বিপদ।

একটি সাঁওতালী মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে—সুঠাম তার দেহের গঠন, নিকটের বস্তীতে তার বাড়ি। অনেক দিন থেকে তাকে দেখছি, সেও আমায় দেখছে।

সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বললে—ছেলে হয়ে হয়ে মরে যায়, তার মাদুলি আছে তোমার কাছে সাধুবাবা?

এমন ভাবে করুণ সুরে বললে—আমার মনে দয়া হোল। মাদুলি দিতে জানি একথা বলিনি, তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম। তারপর সে চলে গেল।

মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্তিতে। কি ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি, কি ভীষণ মুখের ভাব! সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না—চণ্ডিকা দেবীর রোষকটাক্ষে যেমন লোলজিহ্বা, করালিনী প্রচণ্ডা কালভৈরবী মূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল—এও যেন ঠিক তাই।

সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি, সে মানুষ নয়—মানুষের পর্যায়ে সে পড়ে না। মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না, পিশাচী হয় না—মানবীই থেকে যায়।

ভীষণ পূতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল—প্রতি দিনের মত কস্তুরীর সুবাস কোথায় গেল মিলিয়ে! তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী—দেখেই মনে হোল এরা দেবীও বটে,

বিদেহী পিশাচীও বটে। এদের ধর্মাধর্ম নেই, সব পারে এরা। যে হাতে নায়িকার মত ফুলের মালা গাঁথে, সেই হাতেই বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায়, নিমেষে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত।

আমার ভীষণ ভয় হোল।

পিশাচী মধুসুন্দরী তা বুঝে বললে—ভয় কিসের?

বললুম—ভয় কই? তুমি রাগ করেছ কেন?

খল খল অট্টহাস্যে নির্জন অন্ধকার ভরে গেল। আমি শিউরে উঠলাম।

পিশাচী বললে—শব চিনতে পারবে? অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বৌয়ের শব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায়—চিনতে পারবে? তুমি না যদি চিনতে পারো, দু'টি শবে জড়াজড়ি ক'রে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে।

হাত জোড় ক'রে বললুম—দেবী, তোমায় ভালবাসি। ও মূর্তি আমায় দেখিও না—আমায় মারো ক্ষতি নেই—কিন্তু অন্য কোন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে? দয়া করো।

বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম। তখন আবার যে দেবী, সে দেবী। বললেন—সেই সাঁওতালের মেয়ের মূর্তিতে আমায় দেখতে চাও? সেই মূর্তিতে এখনি দেখা দেবো।

বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বরং আরও নিটোল গড়ন শরীরের, মুখের ভাব আরও কমনীয়।

বললুম—ও চাই না—তোমার মূর্তি দেখাও দেবী।

সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কালসাপ নিয়ে খেলা করচি আমি। গুরুদেব বারণ করেছিলেন এই জন্যেই। হয়তো একদিন মরবো এর হাতেই। সাপুড়ে সাপ খেলায় মন্ত্রে—আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছোবলেই মরে। এভাবে বেশীদিন কিন্তু ছিল না। কিছুদিন পরে পিশাচী মূর্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে। তাতেও বুঝলুম এ সাধারণ মানবী নয়—অমানুষিক ধরণের এদের মন। মানুষের বিবর্তনের জীব এরা নয়। হয় তার ওপরে, নয় তার নীচে।

একদিন দেবী আমায় বললেন—আর কিছুদিন যাক্ তোমায় বহুদূর নিয়ে যাবো—

—কোথায়?

—সে বলবো না এখন।

—কতদূরে? কোন্ দিকে?

—এতদূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তবে তোমার ভাগ্যে আছে কি তা?

সব ভুলে গেলাম আবার। পিশাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে—আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী, যৌবনচঞ্চলা, মুগ্ধস্বভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী। দেবীই বটে।

আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লুম, মাথার ঠিক রইল না।

একদিন বললেন—বিপদ আসচে তোমার, তৈরী হও।

—কি বিপদ?

—তা বলবো না।

—প্রাণ-সংশয়ের বিপদ?

—তা বলবো না।

—তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের?

—আমি ঠেকাতে পারবো না। কেউ ঠেকাতে পারবে না। যা আসচে, তা আসবেই।

কথা খেটে গেল শীগ্‌গির, খুব বেশী দেরি হয়নি।

তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল, বোধ হয় বাঙালীই হবে, অল্প বয়সে বরাকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা ব'সে থাকে—আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে।

তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় জট, গায়ে খড়ি উড়ছে—এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে। বাড়ি ধরে আনবার জন্যে টানাটানি, আমি কিছুতেই আসব না, ওরাও ছাড়বে না। আমার তখন সত্যিই জ্ঞান নেই, সত্যিই আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। ওরা হয়তো আমায় আনতে পারত না—কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়িনী রূপে, তিনি নিরুৎসাহ করলেন।

—কি রকম?

ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের একটি গোয়ালঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল। গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেবীকে বললাম—আমি এই নদীতীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন—যেতে হবেই, এই আমার অদৃষ্টলিপি। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না। তিনি জানেন, এই রাতের পরে জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। আগে থেকে বলে তৈরী ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যেই।

দেবী ত্রিকালজ্ঞা, তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি কি ক'রে তিনি একথা জানলেন। হ'লও তাই, বাড়ী আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল ক'রে দিয়েছে। দিনকতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল—বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই থেকেই আমি সংসারী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাঁকে আহ্বান করেন নি কেন?

—বাপ রে! এ কি ছেলেখেলা? মারা যাব শেষে! অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন? সে-চেষ্টাও কখনো করিনি। সে কতকাল হয়ে গেল, সে কি আজকার কথা?

—আচ্ছা, এখন আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে, উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

ইচ্ছে হয় না কে বলেছে? বললুম তো ঐ তিনমাসই বেঁচে ছিলাম। দেবী এসে-ছিলেন মানুষী হয়ে। এদিকে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনী, তেজে কাছে ঘেঁষা যায় না—অথচ কি মানবীই হয়ে যেতেন, যখন ধরা দিতেন আমায়! প্রিয়ার মত আসতেন কাছে, অমনই মিষ্টি, অমনই ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান, বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তাঁর মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো—এমনি কত রাত ধরে! এক এক সময় ভ্রম হ'ত তিনি সত্যই মানুষীই হবেন।

বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাতটিতে বললেন—নদীতীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলব ভেবেছ! আমাদের পক্ষেও সুলভ এ নয়, ভেবো না আমরা খুব সুখী। আমাদের মত সঙ্গীহারা, বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে? প্রেমের কাঙাল আমরাও। কত দিন পরে একজন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া চায়, তার জন্যে আমাদের মন সর্বদা তৃষিত হয়ে থাকে কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনে, আগ্রহ ক'রে যে না চায় তার কাছে যাই নে, সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না, নিজেও আনন্দ পাবে না, যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টলিপি; কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনে—কি না কি ঘটে যায়, ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ক'জন আমাদের ডাকে? ক'জন বিশ্বাস করে? সুখী ভেবো না আমাকে।

বলিলাম—এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ংকর বলেছিলেন কেন আগে?

—ব্যাপার ভয়ংকর এই জন্যে যে আমার সারা জীবনটা মাটি হয়ে গেল ঐ তিন মাসের সুখভোগে। কোন দিকে মনই দিতে পারিনে—মধ্যে তো দিনকতক উন্মাদ হয়েই গিয়ে-ছিলাম, বিয়ের পরেও। তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ ক'রে যা হয় একরকম—সেও দেবীরই দয়া। তিনি বলেছিলেন, জীবনে কখনও অন্নকষ্টে আমায় পড়তে হবে না। পড়তে কখনও হয়নি—কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে?

তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলাম। এত অদ্ভুত, অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়া-

ছিল ততক্ষণ ওর চোখমুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই—কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম?

ছেলে-ধরা

সবাই মিলে বাসায় ফিরে এলাম।

এসেই দেখি ঝুমরির মা বাংলোর বারান্দাতে বসে। তার সঙ্গে নাহানপুর গ্রামের কয়েকটি লোক। নাহানপুর শোন নদের ধারে একটা গ্রাম—বেশির ভাগ গোয়ালার বাস এ গ্রামে। শোনের চরে গরু মহিষ চরিয়ে দুধ ঘি উৎপাদন করে। ডিহরি থেকে ঘি চালান যায়। এই নাহারপুর গ্রাম থেকেই তিনটি ছেলে হারিয়েছে গত পনেরো দিনের মধ্যে। ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি যে হয়েছে এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে, সেটাকে নিতান্ত অকারণ বলি কি করে।

একটা লোক এগিয়ে এসে বললে—কি হল বাবু?

আমরা বললাম—কিছু না, তোমরাও তো খুঁজছিলে।

—হাঁ বাবুজি। আমাদেরও কিছু না।

—তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

—বহুৎ দূর, বন-জঙ্গলের দিকে। সে সব দিকে তোমরা যেতে পারবে না। তোমরা চেন না সেদিক। পরে ওরা পরামর্শ করতে বসল। আমরা বাঙালী বাবু, লেখাপড়া-জানা, আমরা কি দিই পরামর্শ ওদের? পনেরো দিনের মধ্যে তিনটি ছেলে উধাও। এখানে বাস করা দায় হয়ে উঠল। ডিহিরি শহর এখান থেকে অনেক দূর। প্রায় ন মাইল রাস্তা। সেখানে গিয়ে পুলিশের সাহায্য চাওয়া কি উচিত নয়?

আগের লোকটার নাম মন্নু আহীর। মন্নু বললে ওই অঞ্চলের হিন্দীতে—বাবু, জঙ্গল পাহাড় অঞ্চলের গাঁ। বেশী লোক থাকে না এক গাঁয়ে। দূরে দূরে গাঁ। এখানে এই রকম বিপদ হলে আমরা কি করে বাঁচি? আপনারা এসেছেন বেড়াতে, মজুমদার সাহেবের কুঠিতে আছেন, তবু কত ভরসা আমাদের। মজুমদার সাহেব বড়লোক, আসেন না আজকাল আর। আগে আগে যখন নতুন কুঠি বানালেন, তখন কত আসতেন।

ওরা সেদিন চলে গেল যখন, তখন রাত দশটা। বেশ দল বেঁধে মশাল জেবলে চলে গেল।

সতীশ গিরির দলপতিত্বে পরদিন হৈ হৈ করে হারানো ছেলে খুঁজতে বেরনো গেল। রোটাস গড়ে ওঠাই হত এবং ঠিক ছিল। কিন্তু একজন মহিষ-চরানো বৃদ্ধ রাখাল আমাদের বারণ করলে। ওখানে কি করতে যাবে বাবুজী, রোটাস গড়ে লোক থাকে না। চৌকিদার একজন আছে, সে সব সময় ওপরে থাকে না, নিচে নেমে আসে। ওখানে যাওয়া মিথ্যে।

বনের মধ্যে একস্থানে আমরা সেদিন বাঘের থাবার দাগ পেলাম। মহুয়া গাছের তলায় দিব্যি বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ। আমাদের মধ্যে একজন বললে—ওদের বাঘে নিচ্ছে না তো? যে বাঘের ভয় এদেশে—

হীরু বললে—তাই বা কি করে সম্ভব? বাঘ গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলে সেখানে তো পায়ের দাগ থাকত।

দুপুরে আমরা খেতে এলাম বাসায়। শোনের চরে বালুহাঁস শিকার করেছিল ধীরেন আজ সকালে, আমাদের বেরোবার আগে। দশ মিনিটের মধ্যে তিনটি। খুব মজা করে

আমার উঠোন দিয়ে রোজ কাশী কবিরাজ একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে যেন কোথায় যায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে—এই যাচ্ছি সনকপুর রুগী দেখতে, ভায়া—

একদিন বললে—নৈহাটি যাচ্চি রুগী দেখতে, সেখান থেকে শ্যামনগর যাবো।

—সেখানেও আপনার রুগী আছে বুঝি?

—সব জায়গায়। কলকাতায় মাসে দুবার যাতি হয়।

আমার হাসি পায়। কাশী কবিরাজ আমাদের গ্রামে বছরখানেক আগে পাকিস্তান থেকে এসে বাসা করেছে। জঙ্গলের মধ্যে একখানা দোচালা ঘর। আমগাছের ডালপালায় ঢাকা। দিনে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। ছেঁড়া কাপড় পরে কাশী কবিরাজের বৌকে ধান সেদ্ধ করতে দেখেছি। এত যদি পসার, তবে এমন অবস্থা কেন?

একদিন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আকাশে ঘন মেঘ এসে জমলো। বৃষ্টি আসে-আসে। কাশী কবিরাজ দেখি আমার উঠোন দিয়ে হনহন করে চলেচে ব্যাগ হাতে।

ডেকে বললাম—ও কবিরাজ মশাই—শুনুন শুনুন, কোথায় চললেন? বৃষ্টি আসচে—

কাশী কবিরাজ আমার চণ্ডীমণ্ডপে এসে উঠে বসলো।

বললে—একটু রাণাঘাট যাতাম এই ট্রেনে, রুগী ছেলো।

—কে রোগী?

—একজন মাদ্রাজী। পা ফুলে বিরাট হয়েচে, সব ডাক্তারে জবাব দিয়েচে। তিনবার এক্স্-রা কত্তি গিয়েলো। আমি বলিচি, ওসব এক্স্-রা টেক্স্-রা আমার সঙ্গে লাগবা না। আমার মুখিই এক্স্-রা—

আমার হাসি পেলো। নিজের যদি অত গুণ, তবে দোচালায় বাস কর কেন জঙ্গলের মধ্যে? লম্বা লম্বা কথা বললেই কি লোকে তোমাকে বড় কবিরাজ ভাববে?

—একটু চা খান, দাদা—

—তা খাওয়াও ভাই, বৃষ্টি এলো। একটু বসেই যাই—

—আপনার পসার তাহোলে বেশ বেড়েচে?

—বাড়বে কি ভায়া, বরাবর আছে। আমার তান্ত্রিক কবিরাজি। যা কেউ সারাতি পারবে না, তা আমি সারাবো।

—বলেন কি!

—এই জন্যেই তো আমার পসার। শুধু ঝাড়ানো—কাড়ানো—

—ঝাড়িয়ে রোগ সারিয়েছেন?

—আরে এ পাগল বলে কি? বড় বড় রোগ ঝাড়িয়ে সারিয়েচি।

—বটে!

তোমরাই ইংরাজি লেখাপড়া জান কিনা,—সমস্ত অবিশ্বাস করো জানি। ভূত মান?

এই রে! ঝাড়ফুঁক থেকে এবার ভূতপ্রেতে এসে পৌঁছুলো! কাশীনাথ কবিরাজ অনেক কিছু জানে দেখছি। বললাম—যদি বলি মানিনে?

—তা তো বলবাই, ইংরাজি পড়াতে তোমাদের ইহকালও গিয়েচে, পরকালও গিয়েচে! রাগ করো না ভায়া। যা সত্যি, তাই বললাম। চা এসেচে? তাহলি একটা গল্প শোনো বলি। আমার নিজের চোখে দেখা।

খুব বৃষ্টি এসে পড়লো, চারিদিক অন্ধকার করে এলো। কাশীনাথ কবিরাজ তার গল্প আরম্ভ করলো।

কাশীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক-মতে চিকিৎসা করে বলে অনেক দূর দূর থেকে তার ডাক আসে। আজ বছর দশেক আগে হরিহরপুরের জমিদার শিবচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ি থেকে তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্যে কাশীনাথের ডাক এলো।

আমি বললাম—আগে কখনো সেখানে গিয়েছিলেন আপনি?

—না।

—নাম জানতেন?

—খুব। আমাদের ওদেশে হরিহরপুরের জমিদারের নাম খুব প্রসিদ্ধ।

—যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বেলা কত?

—সন্দের কিছু আগে। তারপর শোনো—

কাশীনাথ ওদের বাড়ি দেখে অবাক্ হয়ে গেলো। সেকেলে নামকরা জমিদার, মস্ত বড় দেউড়ি, দু-তিন মহল বাড়ি। দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘর, তার পাশে একটা বড় বারান্দা। ওদিকে ঠাকুর-দালান, বাইরে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ। তবে এ সবই ভগ্নপ্রায়—পূর্বের সমৃদ্ধি ঘোষণা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, বড় বড় বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে বাড়ির গায়ে। মন্দিরের চূড়োর ফাটলে বন্য শালিখের গর্ত, কাঠবিড়ালির বাসা। সামনে বড় একটা আধ-মজা দীঘি পানায় ভর্তি।

সন্ধ্যার কিছু আগে সেই মস্ত বড় পুরনো ভাঙা বাড়ি দেখে কাশীনাথের মনে কেমন এক অপূর্ব ভাব হোলো।

আমি বললাম—কি ভাব?

—সে তোমারে বলতে পারিনে, ভায়া। ভয়ও না, আনন্দও না। কেমন যেন মনে হোল, এ বস্ত অপয়া বাড়ি—এ ভিটেতে পা না দেওয়াই ভালো আমার পক্ষি। তোমার হবে না, কিন্তু আমার হয় বাপু, এমনি।

—অন্য কোথাও হয়েচে?

—আরও দু-একবার হয়েচে এমনি। কিন্তু সে কথা এখন আনবার দরকার নেই। তারপর বলি শোনো না—

তারপর কাশী কবিরাজ সেখানে গিয়ে রোগী দেখল। দশ বৎসর বয়সের একটি ছেলের টাইফয়েড জ্বর, খুব সংকটাপন্ন অবস্থা। কাশী কবিরাজ গিয়ে তান্ত্রিক প্রণালীতে ঝাড়ফুঁক করে শেকড়-বাকড়ের ওষুধ বেটে খাওয়ালো। রোগী কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠলো।

অনেক রাত্রে কাশী খাওয়া-দাওয়া সেরে দেউড়ির পাশে বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখলো, সেখানে তার জন্যে শয্যা প্রস্তুত। উৎকৃষ্ট শয্যা, দামী নেটের মশারি, কাঁসার গেলাসে জল ঢাকা আছে, ডিবের বাটিতে পান,—সব ব্যবস্থা অতি পরিপাটি।

আমি বললাম—বড়লোকের বাড়ির বন্দোবস্ত—

—হাজার হোক, বনেদী ঘর তো? যতই অবস্থা খারাপ হোক, পুরনো চাল-চলন যাবে কোথায়?

—তারপর?

কাশী কবিরাজ বেশিক্ষণ শোয়নি, এমন সময় সে দেখল ঘোমটাপরা একটি বৌ হনহন করে মাঠের দিক থেকে এসে দেউড়ির মধ্যে দিয়ে জমিদার-বাড়ি ঢুকচে। কাশী খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো। এত রাত্রে বাইরের মাঠ থেকে এসে বাড়ি ঢুকলো কে? ভদ্রলোকের ঘরের সুন্দরী বধূ বলেই মনে হলো, যতটুকু দেখেছে তা থেকেই।

যাক্। সে এসেছে কবিরাজি করতে, অতশত খোঁজে তার কি দরকার? যে যা ভালো বোঝে করুক।

আমি বললাম—রাত তখন কত?

—রাত একটার কম নয়, বরং বেশি।

—যেদিক থেকে এলো, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই?

—না মশাই। ফাঁকা মাঠ অনেকখানি পর্যন্ত, তারপর কোদালে নদী। কোদালে নদীতে গরমকালে জল থাকে না। হেঁটে পার হওয়া যায়—তার ওপারে বলরামপুর গ্রাম।

—আপনি কি করে বুঝলেন ভদ্রবংশের মেয়ে?

—হাত-পায়ের যতটুকু খোলা, ধবধবে ফরসা। আধ-জ্যোৎস্না রাত, আমি দিব্যি টের পাচ্ছি—মুখখানা অবিশ্যি ঘোমটায় ঢাকা ছেলো।

—বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার সময় অন্য কোনো লোক সেখানে ছিলো?

—না।

—আপনাকে টের পেয়েছিলো?

—কোনদিকে না চেয়ে হনহন করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কাশী কবিরাজ নির্বিরোধী ভাল লোক, সে জলের গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম আর আসে না, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। লোকে বাড়িতে চিকিৎসক ডাকে ঘুমুবার জন্যে নয়। কাশী কবিরাজ অভিজ্ঞ লোক, দায়িত্ব বোধ তার যথেষ্ট, সে অবস্থায় তার চোখে ঘুম আসে কি করে?

মিনিট খানেক পরে কাশী হঠাৎ দেখলে, সেই বৌটি তার পাশের দেউড়ি দিয়ে আবার বার হয়ে যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে তড়াক করে উঠে পড়লো। বৌটি ক্রমে দূর মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কাপড় দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম—মাঠের দিকে গেলো একা?

—একদম একা। আর অত রাত!

—আপনি কি ভাবলেন?

—আমি আর কি ভাববো মশাই, একেবারে অবাক্। এত রাত্রে একটি সুন্দরী মেয়ে এমন ভাবে যে নির্জন মাঠের দিকে চলে যেতে পারে, তা কখনো দেখিওনি।

কাশী কবিরাজ সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে বললে—শীগ্‌গীর আসুন, কবিরাজ মশাই, রোগী কেমন করচে।

কাশী গিয়ে দেখে, রোগীর অবস্থা সত্যই খারাপ। কিন্তু হঠাৎ এত খারাপ হওয়ার কথা তো নয়। যাহোক্ তখনকার মত ব্যবস্থা করতে হোলো। অনেকক্ষণ খাটুনির পরে রোগী খানিকটা সামলে উঠলো। তখন আবার এসে শুয়ে পড়লো কাশীনাথ বাইরের দেউড়ির ঘরে।

পরের দিনমান রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকেই চললো। জমিদারবাবুর মন বেশ ভালো—প্রথম দিন বড়ই যেন মুষড়ে পড়েছিলেন। এমন কি কবিরাজের সঙ্গে বসে দুপুরের পর খানিকক্ষণ পাশাও খেললেন। কবিরাজকে তাঁদের বড় দীঘিতে একদিন মাছ ধরতে যাবার আমন্ত্রণও জানালেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও দুপুরে বেশ ভালোই হোল—মাছের মুড়ো, দই, দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি। কবিরাজ খুব খুশী...। জমিদারবাবু বেশ প্রফুল্ল।

সেই রাত্রে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। এমন ধরনের ব্যাপার কাশী কবিরাজ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রোগীর অবস্থা ভালো থাকার দরুন সেদিন আর বেশি খাটুনি ছিলো না ওর। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শয্যা আশ্রয় করলো কিন্তু ঘুম আসতে দেরি হোতে লাগলো। কোথাকার ঘড়িতে একটা বেজে গেলো ঢং করে। ঠিক সেই সময়ে দেখলো কাশী কবিরাজ, সেই ঘোমটাপরা বৌটি দেউড়ি দিয়ে ঢুকে অন্দরের দিকে চলেছে।

বলতে কি কাশী কবিরাজের বড় বিস্ময়বোধ হোল! কি সাহস মেয়েটার! এত রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে ভয়ও কি করে না?

মিনিট পনেরো কেটে গেলো, কি বিশ মিনিট। তারপর কাশী কবিরাজকে আশ্চর্য স্তম্ভিত করে দিয়ে সেই বৌটি ওর ঘরে এসে ঢুকলো। আমি বললাম—আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ, একেবারে আমার সামনে।

—ঘরে আলো ছিলো?

—বাড়িতে রোগী থাকার দরুন আমার ঘরে সারারাতই একটা হারিকেন জ্বলে।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মুখের ঘোমটা অনেকখানি তুলে কবিরাজের দিকে চাইলো। বেশ সুন্দরী মহিলা। দেখলে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়, এমনি চেহারা। কাশী কবিরাজকে বলল—তুমি এখানে থেকো না, চলে যাও এখান থেকে।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত কাশী কবিরাজ মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বলল—আপনি কে মা?

—আমি যেই হই, তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

—মা, আমি চিকিৎসক। রুগী দেখতে এসেচি। আমার কাজ না সেরে আমি কি করে যাবো?

—তুমি এ রুগী বাঁচাতে পারবে না। কাল সকালে তুমি চলে যাও এখান থেকে—

—কি করে আপনি জানলেন রুগী বাঁচবে না!

—আমি ওর মা। ওর সৎমা ওকে খুব কষ্ট দিচ্চে, সে কষ্ট আমি দেখতে পারচিনে—আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেচি—নিয়ে যাবোই। তুমি তাকে কিছুতেই রাখতে পারবে না—

কাশীনাথ কবিরাজ তখনো ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেনি! সে আমতা-আমতা করে বললে—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি মারা যাওয়ার পরে আজ চার বছর হোল ওর বাবা আবার বিয়ে করেচে। আমার সেই সতীন ওকে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি সেখানে শান্তিতে থাকতে পারি না—খোকা আপন মনে কাঁদে। আমি শুনতে পাই—ওকে আমি নিয়ে যাবোই। তুমি কেন অপযশ কুড়োবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—

কাশীনাথের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছে যেন। কি ব্যাপারটা সামনে ঘটচে, তার যেন কোনো ধারণাই নেই, তবুও সে হাতজোড় করে বললে—মা, একটা কথা। আমি জমিদারবাবু—আপনার স্বামীকে সব বলি। তিনি তাঁর ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন। ছেলেটিকে আপনি নিয়ে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে, সেটা তো আপনার বিবেচনা করা উচিত।

বৌটি বললেন—তাঁর এ পক্ষের ছেলেমেয়ে হবে। তাঁদের নিয়ে থাকবেন তিনি—

—ও কথা বলবেন না, মা। আপনি তাঁর কথা চিন্তা না করলে কে চিন্তা করবে? সব দিকে বুঝুন। তাঁর কথা ভাবতে হবে আপনাকেই। আমি আজই সব বলচি তাঁকে খুলে। যদি তিনি তাঁর এ পক্ষের স্ত্রীকে ব'লে ছেলেটির ওপর অত্যাচার নিবারণ করতে পারেন, তবে আপনি আমাকে কথা দিন, ছেলেটিকে আপনি নিয়ে যাবেন না? আমি সে চেষ্টা করি, মা?

—করো।

বলেই মূর্তি অদৃশ্য হোল না কিন্তু। ঘর থেকে বার হয়ে দেউড়ি দিয়ে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গিয়ে নিশীথ-রাত্রের শুভ্র জ্যোৎস্নার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

—আমি জিগ্যেস করলাম—বলেন কি!

—হ্যাঁ মশাই।

—আচ্ছা, এ মূর্তির কোনো অংশ অস্পষ্ট নয়?

—দিব্যি মানুষের মত। কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই কোথাও। কথাবার্তা বললাম, আমার কোনো ভয় হোল না। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলচি, তেমনি মনে হোল।

মূর্তিটি অদৃশ্য হওয়ার খানিক পরেই বাড়ির মধ্যে থেকে কাশীকে ডাকতে এলো। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। অথচ সমস্ত দিন এমন ভালো ছিলো। তখনকার মত সুব্যবস্থা করে ভোরের দিকে কাশী কবিরাজ জমিদারবাবুকে বললে—আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, বাইরে চলুন।

আমি বললাম—বাইরে এসে সব কথা বললেন নাকি?

—হ্যাঁ, গোড়া থেকে। বললাম, এই আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিছুক্ষণ আগে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

—বিশ্বাস করলেন?

—কেঁদে ফেললেন। বললেন,—আমি জানি। আমি এই অসুখের সময় একদিন ওকে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি!

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত।

জমিদার বললেন, আমি জানি, ওর সৎমা ওর ওপর খুব সদয় নয়—তবে এতটা আমি জানতাম না। আমি কথা দিচ্চি, খোকা সেরে উঠলে ওর মামার বাড়িতে রেখে লেখা-পড়া শেখবো। এ সংস্রবে আর আনবো না। আমার এ স্ত্রীকেও আমি শাসন করচি। আপনি তাঁকে জানাবেন। রাত ভোর হয়ে গেলো।

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠতে লাগলো। এগারো দিনের পরে কাশী কবিরাজ পথ্য দিলে তার রোগীকে।

বললাম—ওর মাকে আর দেখেননি? আসেননি আপনার কাছে?
—না।

মায়া

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই। দুঃখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবার দোকান এ পর্যন্ত এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা-শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হোল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হোল কিন্তু পেট সমানে জ্বলছে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপাততঃ বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বললে—রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্চি!

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বললে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বললাম—থাকতে পারি।

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুনীর কাজ।

—যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজী হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারী খুশী হোল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বললে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরি মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শুরু হোল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরানো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল! কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্চে। আমায় বললে—চা

করতে জানো? একটু চা-করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বললে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলু ভাতে ভাত,—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে!

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্বদা আলো জেবলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলচি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা রোয়াক, রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধুহাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো, একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাত দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে তুলচে! দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছনে ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বললে—ঝিঙে পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায়?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষমানুষ?

—না, একটি বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বললে—কোথায় বৌ? চলো দিকি দেখি।

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বললে—কৈ বৌ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও ঝোপটার কাছে।

—হুঃ, যতো সব। চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে এত খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে চুরির কথা তুললে। বললে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব দেখতে পাচ্চি, এমন কি ঝিঙে-চুরি-করা বৌকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি?

বুড়ো বললে—না, না, সন্ধ্যার পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।
—কেন?
—তাই বলচি। তোমার বয়স কত?
—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।
—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষট্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।
—আজ্ঞে, নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্চে! ভারী জিনিস সরাচ্চে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিস-পত্র গোছাচ্চে! কিন্তু এত রাত্তিরে?
বাবাঃ! কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বললে—আমি?
—হ্যাঁ, অনেক রাতে।
—ও! হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।
—আমাকে বললেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!
চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মত থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখা-শুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—
—কি?
চক্কত্তি-বুড়ো অকারণে সুর খাটো করে বললে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইল তোমার জন্যে।
বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্যে রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!
বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবা বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁ-খানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্চে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?
—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।
—নিবারণ চক্কত্তির? কেন?
—দেখাশুনো করি। কাল এসচি।
—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।
—কেন?
—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল। ওরা নিজেরাই

থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে! অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্চে ওই লোকটার ভয়-দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্কত্তি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালার ফল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে—বেশ মোটাধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটাধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কত্তি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্কত্তি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে দিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে, সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের। কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়! আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, এ কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়?

সে-রাত্রে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে এত কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেকে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোন ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ি, আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝচি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়েবাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল! সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল!

এর পর ন'দিন আর কোন কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না, কি শুনতে কি শুনেচি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল! সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই আর শুধু ঘুমুই। কাজ-কর্ম কিছু নেই—কেমন একরকমের কুড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণতঃ খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েচে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্না-ঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে: কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল, সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেচে। নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম —কৈ, একটা দরজা জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোন শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্দ্রা এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েচে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে। সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নেত্য! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হল্লা!

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতন ভাবে জানলার বাইরের জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পরম আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেচি?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েচি, তা কোথা থেকে এলো? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েচে!

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বললে—কি রকম আছো? বলি, কিছু দেখচো নাকি?

—না।

—শুনচো কিছু?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক-তাক জানো নাকি? ভূতের মন্তর?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দ্যাখোনি? বৌ মত? কোনো গন্ধ পাওনি?

—কিসের গন্ধ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকতো, তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যেতো। দুটি লোকের এই রকম হয়েচে এ পর্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয়ে ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না! তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হোল নাকি? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হোল, নাঃ, সব ভুল! পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা খাসা আছি!

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তি মশায় মাইনে-টাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনো করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।

ভৌতিক পালঙ্ক

অনেকদিন পর সতীশের সঙ্গে দেখা। বেচারা হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে বিকালবেলা বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথ দিয়ে উত্তরমুখে চলেছিল। সমস্ত আপিসের সবেমাত্র ছুটি হয়েছে। শীতকাল। আধ-অন্ধকার আধ-আলোয় পথ ছেয়ে ছিল। ক্লান্ত দেহে ছ্যাকড়া-গাড়ির মত ধীরে ধীরে পথ ভেদ করে চলেছিলাম। সহসা সতীশের জামাটা চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলাম—আরে, সতীশ যে!

সতীশ সবিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে বলে উঠল—খগেন! বাই গড্! আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বললাম—তার প্রমাণ, আমাকে ধাক্কা দিয়েই তুমি চলে গেছলে আর একটু হলে! ভাগ্যিস্ ডাকলাম!

—সরি। আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত।

—তা তো বুঝতেই পারছি। তা কোথায় চলেছ শুনি?

—তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বেশীদূর নয়। যাবার পথে সব বলব।

—আশ্চর্য!

—'না' বললে শুনব না। জোর করে নিয়ে যাব।

ছেলেবেলা থেকেই সতীশকে চিনি। কথা অনুযায়ী সে কাজ করে। আজ শরীরে কিছু বল থাকায়, প্রায়ক্ষেত্রে সে বলপ্রয়োগ করে স্বার্থসিদ্ধি করতে ভোলে না। অগত্যা তার সঙ্গে যেতে হোল।

তার গন্তব্যস্থান খুব নিকটেই ছিল এবং সে তার উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপেই ব্যক্ত করল। সেদিন সকালে খবরের কাগজে বেচা-কেনার কলমে একটি বিজ্ঞাপন ছিলঃ

"একটি অতি আধুনিক এবং রহস্যজনক চীনদেশীয়
খাট অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রয় করা হইবে।
জগতে ইহা অদ্বিতীয়। সুযোগ হারাইলে
অনুশোচনা করিতে হইবে।
২।৩.....স্ট্রীট।"

সতীশ তার পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটি বার করে বললে—পড়।

—বুঝলাম। তা 'রহস্যজনক' শব্দটার মানে কি?

—ঐটেই তো আমায় ভাবিয়ে তুলেচে! কোনো হদিস করে উঠতে পারছি না।

সতীশ চলছিল রাস্তার নাম দেখতে দেখতে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল—পেয়েছি। এই গলি।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই গলির পানে তাকিয়ে আমার সারা শরীরে—কেন জানি না—একপ্রকার শিহরণ জাগল। চীনাপল্লীর চীনা-আবহাওয়ায় রহস্যজনক খাট! সতীশের হাতটা ধরে বললাম—খাটে কাজ নেই সতীশ, চল ফিরে যাই। আমার বাঙালী-খাট বেঁচে থাকুক।

সতীশ প্রবলবেগে এক ঝাঁকানি দিয়ে উঠল—ভীতু কোথাকার! এতটা এগিয়ে এসে কখনও ফেরা যাবে না।

গলির মোড়ে ডান পাশে একটা নিমগাছ ভূতের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে যত সব অখাদ্য-কুখাদ্যের উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে। অন্নপ্রাশনের ভাত যেন ঠিকরে বার হয়ে আসতে চাইল অসহ্য যন্ত্রণায়! নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনগতিকে পথ চলতে লাগলাম।

একটা দমকা বাতাস বিভ্রান্ত হয়ে আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে এসে আমাদের শরীরে যেন আছাড় খেয়ে পড়লো। মাথার উপরদিকে কয়েকটা বাদুড় ডানার শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। দুটো অভিভাবকহীন কুকুর এই অনধিকার-প্রবেশকারীদের পানে চেয়ে বিশ্রী সুরে অভিযোগ করতে লাগল।

পথে আর জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। পাশে একটি চীনা-ডাক্তারের বহু পুরাতন সাইন-বোর্ড। তার উপরকার নরকংকালের ছবিটি জীর্ণপ্রায়। কোথা থেকে একটি পিয়ানোর অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছিল।

শীঘ্রই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট গৃহে এসে পৌঁছোলাম। অমন বাড়ি আমি আর জীবনে দেখিনি। ইট বার-করা পঙ্গুপ্রায় বহু প্রাচীনকালের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে এই বাড়ির ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল।

ভাঙা ফটক দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। এত লোক এখানে কোথা থেকে এল? যে নির্জন নিস্তব্ধ গলি আমরা পিছু ফেলে আসলাম, সেখানে তো কারুর ছায়া পর্যন্ত খুঁজে পাইনি! ভৌতিক কান্ড নাকি? সকলের মুখেই কৌতূহলের ছাপ বর্তমান। নানা জাতির লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। এতগুলি লোক, কিন্তু কারুর মুখে একটি কথা নেই। ছুঁচ পড়লে পর্যন্ত তার শব্দ শোনা যায়।

ঘণ্টাখানেক পর একটি বৃদ্ধ মোটা চীনা আমাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেল। তার মাথার একটি চুলও কাঁচা ছিল না। তার সামনের ওপরের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, আর বাঁ হাতের উল্কিতে একটি ভোজালির ছবি। সে আমাদের ইশারা করে

অনেকগুলি ঘর পার করে সেই খাটের ঘরে নিয়ে গেল। বাড়িটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত—চারিদিকে গোলকধাঁধা।

হ্যাঁ, খাট বটে! অমন খাট আমি জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। খাট আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক ঐ রকম আশ্চর্য চীনা-খাট সেই প্রথম এবং শেষ দেখলাম। তার অপূর্ব ভাস্কর্য, অপূর্ব কারুকার্য! একপাশে ভগবান বুদ্ধের ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি। আয়তনে খাটটি বিশেষ বড় নয়। দুটি মানুষ বেশ আরামে শুতে পারে। আবার আশ্চর্য, সেই খাট বাড়িয়ে দশজনের জায়গা করা যায়! দেখে চমকে গেলাম। সকলের সঙ্গে দরকষাকষি হতে লাগল। ঐ সামান্য একটা কাঠের খাটের প্রতি সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়েছিল। কেনবার জন্যে সকলের কি সে ব্যাকুলতা! দাম হু-হু করে বাড়তে লাগল। শেষে সতীশের ভাগ্যেই ঐ খাটটি জুটল—পনরো-শ টাকায়।

সেই খাট নিয়ে বাড়ি ফিরতে সতীশের প্রায় দশটা বাজল। যে দেখল, সেই বলল—চমৎকার!

সেখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করে আমি বাড়ি গেলাম। সতীশ বলল—আবার এস, নেমন্তন্ন রইল।

—তথাস্তু। বলে চলে এলাম।

আমি যাবার আগেই পরের দিন সকালে সতীশ এসে হাজির। উস্কখুস্ক চুল, মুখ শুকনো। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় হয়তো সারারাত্রি ঘুম হয়নি!

আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—আরে, ব্যাপার কি?

—বিপদ, বিষম বিপদ! সতীশের গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না।

—কিসের বিপদ?

—সেই খাট!

—একটা যে কিছু হবে, তা আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কেউ কখনও খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসে? হাজার হোক, ওটা একটা রহস্যজনক খাট।

পূর্বরাত্রের ঘটনা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। সারারাত্রি সে ঘুমোতে পারেনি। ঐ খাটের ওপর সে শুয়ে ছিল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে তার মনে হোল, কে যেন খাটটা নাড়াচ্ছে! উঠে সুইচ টিপে আলো জেলে দেখল, না, খাট ঠিকই আছে। আবার শুয়ে পড়ল—আর খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল। কিসের একটা ভীষণ শব্দে সারা ঘরখানা যেন গমগম করছে! দেওয়ালের সঙ্গে যেন খাটখানার ভীষণ ঠোকাঠুকি হচ্ছে!

ধড়মড় করে উঠে ও আলো জ্বালল। না। সব কিছু নিঃশব্দ নিথর—কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। সে আবার শুয়ে পড়ল। এবার আর সে আলো নেবাল না। ভোররাত্রে কার দুর্বোধ্য আর্তকণ্ঠের বিলাপধ্বনিতে তার চেতনা ফিরে এল। কে যেন খাটের পাশে বসে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছিল।

আমি বললাম—বলেছিলাম তো তোমায় প্রথমেই, ও খাট কিনে কাজ নেই। যেমন তোমার রোখ্। এইবার বোঝো।

সতীশ বলল—দেখ খগেন, তোমায় হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না। ঐ হতভাগ্য খাটখানার ওপর এমন মায়া লেগে গেছে যে কি বলব! আমি ওকে ছাড়তে পারব না কোন মতেই।

—তবে মর ঐ নিয়ে!

—আমি তোমার সাহায্য চাই।

—আমার সাহায্য!

—হ্যাঁ, আজ তুমি আমাদের ওখানে রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারারাত না ঘুমিয়ে ঐ খাট পাহারা দেব। দেখি, ওর গলদ কোথায়!

—আর আমার আপিস?

—পাগল, কাল যে রবিবার!

অগত্যা বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

সতীশ আমার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে ছিল। সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল—সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্!

—তারপর! আর কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?

—না, দিনের বেলা গণ্ডগোল হবার তো কোন কারণ নেই!

সতীশের মা বললেন—দেখ দেখি বাবা খগেন, এত বলছি—যা, বিক্রি করে দে, তা আমার কথা যদি ও শুনেচে!

সতীশ বলল—বলছ কি মা, ভয় পেয়ে পনরো-শ টাকার খাটটা বিক্রি করব?

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি জাগবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে খাটের ঘরে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে দীনেন রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, আর সতীশের হাতে "হেলথ্ অ্যান্ড হাইজিন"।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। ঠিক হোল, আগে সতীশ ঘুমুবে আর আমি জাগব। তারপর সতীশ জাগবে, আর আমি ঘুমুব।

বইখানা খুলে আমি বসে রইলাম। পড়তে পারলাম না একটি অক্ষরও, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম; চারদিকে কান খাড়া করে বসে রইলাম ভয়ে ভয়ে। এতটুকু শব্দে থেকে থেকে চমকে উঠছিলাম। ঐ বুঝি অপদেবতা আমার গলাটি দিলে টিপে!

কাদের বাড়িতে ঘড়িতে সুর করে দুটো বেজে গেল। হঠাৎ মনে হোল, কে যেন বাইরের বারান্দায় চলে বেড়াচ্ছে! তার পদশব্দ বেশ স্পষ্ট হয় উঠল। আমার সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল, লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সশব্দে খোলা জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে বোধ হোল, আমি যেন শূন্যে উঠে গেছি, আমার জ্ঞান যেন লোপ পেয়ে গেছে। আমি মৃত না জীবিত, তাও ঘোর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। আমি সভয়ে ডেকে উঠলাম—সতীশ! সতীশ!

সতীশ ধড়মড় করে উঠে বসল—ব্যাপার কি খগেন? ব্যাপার কি?

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। সতীশ আমার দু' কাঁধে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—খগেন! খগেন!

আমি আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললাম—ওঃ! যা ভয় পেয়েছিলাম!

—তা তো বুঝতেই পারছি। যাক্ আর তোমায় জাগতে হবে না। তুমি ঘুমোও, আমি জেগে বসে আছি।

—না আমারও ঘুমিয়ে কাজ নেই। আর তা ছাড়া ঘুমও আমার হবে না আদৌ।

—ভীতু কোথাকার!

তারপর ভীতু আমি ও সতীশ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে রইলাম। আমরা দু'জনেই নিঃশব্দে জেগে রইলাম। কেউই একটিও কথা কইলাম না। আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের টুকরো আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। অসংখ্য তারকা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। বোধ হোল, তারা যেন আমাদের বিপদে ফিক-ফিক হাসছে! আমরা চুপটি করে বসে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিকের আলো দপ্ করে নিবে গেল। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—কে?

বোধ হোল কে যেন মেন সুইচ্ বন্ধ করে দিয়েছে!

হঠাৎ এক উৎকট হাসিতে সারা ঘর ভরে উঠল। অমন হাসি আমি জীবনে কাউকে হাসতে দেখিনি। হাসি যেন আর শেষ হতে চায় না। সে কি বিকট শব্দ!—হা-হা-হা-হি-হি-হি-হো-হো-হো-হে-হে-হে...

বোধ হোল, কে যেন ঠিক দরজার কাছে হেসে খুন হচ্ছে! আমি শিউরে উঠলাম।

সতীশ চট করে টর্চটা দরজার ওপর ফেলল। তাতে হিতে বিপরীত হোল। বোধ হোল কে যেন দরজার ঠিক বিপরীত দিকে জানলাটার ধারে বসে আর্তকণ্ঠে বিনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে মরছে! তার কান্নার কোন ভাষা খুজে পেলাম না। কেবল একটা করুণ সুর সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। তার পর সেই খাটের উপর গিয়ে সেই বিলাপ-ধ্বনি আর নড়ল না। তার কান্নায় যেন খাটটা ভিজে গেল। সেই অবোধ্য ভাষার সকরুণ বিলাপ-ধ্বনি চিত্তে এমন এক অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করল, যার ফলে আমাদের সমস্ত

শক্তি যেন ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। মনে হোল, কে যেন ক্লোরোফর্‌ম্‌ দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে দিচ্ছে! আমরা যেন ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়ছি!

সতীশের সাহসটা ছিল কিছু বেশী, তাই সে খাটের উপর টর্চ ফেলে গর্জে উঠল—কে, কে ওখানে?

কিছুই দেখা গেল না, কেউ সাড়া দিল না। সহসা সেই খাটখানা ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হোল অগণিত নরকঙ্কাল যেন তার চারিদিকে নৃত্য করচে। তাদের হাড়ের খটখট শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হোল। আমার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল কিসের যেন বেদনায়। বোধ হোল, হয়তো বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!

একটা একটু করে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোধ হোল, আমি যেন অনেক দূরে এক চীনাবাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি। একটি ছোট ঘরে তখন সেই গভীর রাত্রে টিম-টিম করে একটি দীপ জ্বলছিল। ঘরের মেঝের উপর একটি লোক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েচে।

একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর তার সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা দেখে আমার বড় দয়া হোল। রোগে ভুগে ভুগে বেচারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তার পাশে বসেছিল—তার স্ত্রী হবে বলেই বোধ হোল—চেহারা কিন্তু তার স্বামীর চারগুণ। একটা মস্ত টুলের ওপর বসে সে দুলছিল।

তার পাশেই আমাদেরই এই খাটটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সাত সমুদ্র তের নদী পার করে এটাকে কে এখানে নিয়ে এল?

হঠাৎ স্ত্রীলোকটি বিকট এক হাঁ করে হাই তুলল, তারপর দুটো সশব্দ তুড়ি দিয়ে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল। দেখলাম—তার স্বামী ইতিমধ্যে উঠে সেই খাটের দিকে এগিয়ে গেছে চুপি চুপি। চকিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত তার স্ত্রী তাকে জোর করে খাট থেকে নামিয়ে বিছানায় ফেলে দিলে। সে ভীষণ ভাবে গর্জন করতে লাগল, আর তার স্বামী ব্যাকুলভাবে অনুনয় করতে লাগল, ঐ খাটের পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে! বোধ হোল, সে চায় খাটে উঠতে; কিন্তু তার স্ত্রী তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না।

উত্তেজনায় কাশকে কাশতে তার মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে গেল। আমি শিউরে উঠলাম। তারপর লোকটার মাথাটা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, আর সে উঠল না। তার স্ত্রী তার পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম—ভোরের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। দেখলাম—সতীশের মা আমার চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন।

তিনি আমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে বললেন—খগেন, বাবা খগেন!

আমি বললাম—আমি কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—সতীশ কোথায়?

—সতীশের এখনও জ্ঞান হয়নি।

তারপর শুনলাম—রাত্রি চারটে নাগাদ আমরা নাকি দুজনে সদর দরজায় এসে মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকি। সতীশের মা বাইরে এসে এই অবস্থা দেখে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দেন। পাকা তিন ঘণ্টা তদারক করার পর আমাদের জ্ঞান হয়। ডাক্তার এসে বলে গেছিল—ভয়ের কোন কারণ নেই। একটা 'সাড্‌ন্‌ শক্‌' (sudden shock) আর কি! জ্ঞান হলে একটু ব্রোমাইড দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীশের জ্ঞান হতে সেও সেই আমারই মত অবিকল উদ্ভট স্বরে কথা বলে গেল। আমি বিস্ময়ে সকলের পানে তাকিয়ে রইলাম।

সতীশের মা বললেন—আগে ঐ সর্বনেশে খাট বিদায় কর বাবা!

খাট-বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল। পরের দিন বিকালে অসংখ্য লোকে বাড়ি ছেয়ে গেল। খাটটা বিক্রি হোল—শেষ পর্যন্ত দু'হাজার টাকায়। এক ইহুদী সেটা

কিনে নিয়ে গেল।

যাক, মাঝ থেকে কিছু লাভ হোল। বিক্রি না হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ওটা বিলিয়ে দিতে হোত।

এখন মাঝে মাঝে সেই রহস্যজনক খাটের কথা ভাবি। এক-একবার মনে হয় সেটা এখন কার কাছে আছে, খোঁজ করি। সেই অতৃপ্ত আত্ম—যাকে তার দুর্দান্ত স্ত্রী কোন ক্রমেই ব্যাধির ভয়ে খাটের ওপর জীবিত অবস্থায় শুতে দেয়নি; সে কি আজ তৃপ্ত হয়েছে? না, এখনও সে ঐ খাটের পিছনে প্রতি রাত্রে ঘুরে ঘুরে মরে—কাউকে ওর ওপর শুতে দেবে না বলে?

টান

গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

যাঁর মুখে আমার এ গল্প শোনা, তাঁদের পরিবারবর্গ কর্ম উপলক্ষে পূর্বে আফ্রিকার নাইরোবি শহরে অনেক দিন থেকেই বাস করছিলেন, ও-দেশের নানা গল্প আমি বন্ধুটির মুখে সেদিন বসে বসে শুনেছিলাম।

সকালবেলা, পাহাড়ী পথে একা বেড়াতে বার হয়েচি, একখানা জিপগাড়ী দেখি স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসচে, আমার বন্ধু প্রণববাবু গাড়ীটি চালাচ্চেন। অনেকদিন দেখিনি প্রণববাবুকে—তিনি কবে এখানে এসেচেন, তাও জানি না।

আমাদের এদিকের বাজারে মালিয়া মোহান্তির বড় গোলদারি দোকান। তার কাছে জিগ্যেস করে জানলুম, প্রণববাবু আজ দু-মাস ধরে 'হোমসডেল' কুঠিতে বাস করচেন।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে (কারণ আমাকে পায়ে হেঁটে এই পথটা যেতে হোল তো) প্রণববাবু ও আমি দু'জনে বসে গল্প করছিলাম ও চা পান করছিলাম। অনেক দিন পরে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ এবং দু-জনেই খুব খুশি হয়েছিলাম এই রকম হঠাৎ দেখা হওয়ায়।

প্রণববাবু বললেন—এখানে খেয়ে যাবেন।

—বাড়ীতে বলে আসি নি, স্নান হয় নি—

—সব ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তা হোলে থাকবেন তো,, একটা খুব ভাল গল্প বলবো খেয়েদেয়ে ঐ বুড়ো হর্তুকিতলার ছায়ায় বসে। কেমন? ও লাখপতিয়া, এখানে এস—এই বাবুর বাড়ী গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে।

—এখানে কতদিন আর থাকবেন?

—বুধবারে চলে যাবো। আজ দেখা হওয়াতে বড় ভাল হোল। কতদিন দেখা হবে না আর কে জানে।

—অথচ আমরা কলকাতাতেই থাকি, ঠিকানা না জানাতেই—

—মাংস খান তো?

—খুব।

—নিষিদ্ধ পক্ষীর?

—খুব।

মধ্যাহ্ন ভোজন খুবই ভাল হোল।

এর পর আমরা সেই হর্তুকিতলায় গিয়ে বসি। সামনে পশ্চিম দিকে নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী, ঝির-ঝির বাতাস বইচে নদীর দিক থেকে। একদল সাদা বক পাহাড়শ্রেণীকে পেছনে ফেলে মেঘের তলা দিয়ে উড়ে আসচে এদিকে।

প্রণববাবু বললেন—আপনি আমার জীবনের কথা কিছু কিছু সকালবেলা শুনেচেন। আজ একটি অসাধারণ ঘটনার কথা বলবো। এ আমার নিজের চোখে দেখা বলেই আপনার কাছে বলবার ইচ্ছেটা বড় প্রবল হয়েচে।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও কাকা উগান্ডা রেলপথ তৈরির সময় থেকে ওদেশে ছিলেন। আমার এক কাকা বেলজিয়ান কঙ্গোতে কমলালেবুর আবাদ করেন, আমার বাবার অনেক আগে থেকে তিনি আছেন সে দেশে, তাঁর চার-পাঁচটি ছেলে big game hunter। লোহার মত শরীর, অনর্গল সোহালি ভাষা বলতে পারে, সে দেশের নেটিভদের মতই। এসব কথা গল্পের মত শোনাচ্ছে না কি? কিন্তু ঘর-ভোলা লোকের কাছে এ সব যতই গল্প বলে মনে হোক, আমরা জানি বাঙলা দেশের লোক কত দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। আমাদের পৈতৃক বাসভূমি বলাগড়ের কাছে সিমুলিয়া। দশ বছর বয়সে আমি প্রথম নাইরোবি যাই। ভিক্টোরিয়া নয়ান্‌জা হ্রদের তীরবর্তী কামপালা নামক ছোট শহরে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন ভদ্রলোক স্কুলমাস্টারী করতেন সে সময়—আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময়ে তিনি বিবাহ করেন নি, ছুটি-ছাটাতে নাইরোবিতে আমাদের বাসায় এসে বসতেন। তিনি দিনকতক আমার ইংরিজি পড়াবার ভারও নিয়েছিলেন!

সে সময়ে ওদেশে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল—মাংস, দুধ, মাখন, কফি যথেষ্ট পাওয়া যেত। সমগ্র নাইরোবিতে তিন ঘর বাঙালী পরিবার ছিল। সকলেই উগান্ডা রেলপথের কর্মচারী। আর একজন ছিল খৃষ্টান, ধর্মপ্রচার করবার কাজে কি এক মিশন কর্তৃক প্রেরিত, মাঝে মাঝে নাইরোবিতে থাকতো মাঝে মাঝে দূর পল্লী অঞ্চলে চলে যেতো।

আমি পনেরো বৎসর একাদিক্রমে নাইরোবিতে ছিলাম বাবা-মার সঙ্গে। ওখানকার জীবন খুব ভালই কেটেছিল। জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, জিনিসপত্র ছিল সস্তা, কত নতুন স্বপ্ন তখন দেখেছি অল্প বয়সে। একবার আমার খুড়তুতো ভাই অতুল এসে বেলজিয়ান কঙ্গোর জীবনের এক অপূর্ব ছবি আমার চোখের সামনে ধরলে, সেই আমার তরুণ বয়সে। বাবাকে বললাম, কাকার কমলালেবুর আবাদে গিয়ে কাজ করবো, হাতী, সিংহ শিকার করবো, গল্পের বইয়ের নায়কের মত দুর্দান্ত এডভেঞ্চারপূর্ণ মুক্ত জীবনানন্দ আস্বাদ করবো।

আমি বললাম—তখন আপনার বয়েস কত?

—সতেরো বছর।

—লেখাপড়া?

—কামপালার সেই মাস্টার সীতানাথ বাঁড়ুয্যে ইংরিজি পড়াতেন আর স্টেশন মাস্টার ডসন সাহেবের মেমের কাছে অঙ্ক কষতাম। আমায় বড় ভালবাসতেন ডসব সাহেবের স্ত্রী। তাঁর এক ছেলে ছিল প্রায় আমার বয়সী। একটা এয়ার গান নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতাম। শিকারের ঝোঁক ছিল আমাদের দু-জনেরই। নাইরোবির বাইরে তখন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কণ্টক ও সিমোসা গাছের বনে জেব্রা, সিংহ, জিরাফ, উটপাখীর দল বিচরণ করতো, এখনও করে। আমরা কতবার এই সব অঞ্চলে যেতাম বন্য জন্তু শিকারের জন্যে। একবার একদল সিংহের সামনে পড়েছিলাম—তার মধ্যে এক গর্ভবতী সিংহী ছিল, সে আমাদের প্রায় চোখের সামনে একটা ঝোপের আড়ালে তিন-চারটে শাবক প্রসব করেছিল। —সুতরাং লেখাপড়া সেখানে তেমন হয় নি।

—আপনি ডাক্তার হয়েছিলেন কোথায় পড়াশুনো কোরে?

—সে অনেক পরে। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ি।

—কত বছর বয়সে কলকাতায় আসেন?

—পঁচিশ বছর বয়সে।

—অত বছর বয়সে ডাক্তারি পড়লেন? পাস করেছিলেন?

—হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়ি, মাত্র তিন বছরের কোর্স ছিল তখন। তাতেই যথেষ্ট রোজগার করেছি বা এখনো করছি।

—ভাগ্যটা ভালো আপনার।

—আমি প্রথম প্র্যাকটিস করি ডার-এস-সালামে, তারপর মোম্বাসায়। ওখান থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে কলকাতায় এলাম। পয়সা যা কিছু বেশী রোজগার করি, সবই ডার-এস-সালামে। আবার ইচ্ছে ছিল, সেখানে যাই, কিন্তু সেখানে আর সুবিধে হবে না।

ম্যালান গবর্ণমেণ্টের আওতায় ও উৎসাহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েচে, তাতে ভারতবাসীদের আর সেখানে হয়তো সুবিধে হবে না। ওরাই বেশী ডাকতো।

—কারা ?

—আফ্রিকানরা। ওদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেছিল সে সময়। অনেক মেয়ে ভারতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিল। আস্তে আস্তে উভয় সমাজে এ প্রথাটা চালু হচ্ছিল।

—এইবার আসল গল্পটা বলুন।

—বেলা গিয়েচে। বাকিটুকু অথবা আসলটুকু অতি অল্প, কিন্তু ভারি অদ্ভুত। শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে চলুন চা খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।

চা খাওয়া হলো খুব ভাল। ও-বেলাও যাতে আমি থাকি, সেজন্যে প্রণববাবু ও তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।—এবেলা নাকি ভালো করে খাওয়ানো হোল না।—আমার খাওয়ার নাকি খুবই কষ্ট হোল।

সন্ধ্যার পর আধ-জ্যোৎস্না আধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রণববাবু আবার গল্প শুরু করলেন সেই হর্তুকিতলায় বসে।

এইবার যে কথাটা বলবো, সেটা ভালো করে বুঝতে হোলে আমার মামার বাড়ীর ইতিহাস আপনার কিছু জানা দরকার। আমার দাদামশায় গোবিন্দ ঘোষাল সিপাই বিদ্রোহের সময় ফয়জাবাদ মিলিটারি একাউণ্টেণ্টে কাজ করতেন। তাঁর দুই বিবাহ, আমার দিদিমাকে তিনি বিবাহ করেন যখন, তখন তাঁর বড় ছেলের বয়েস ত্রিশ বছর। আমার মা তাঁর শেষ বয়সের সন্তান; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার সে দিদিমা সধবা অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। আমার মাকে মানুষ করে বামা বলে এক পুরোনো ঝি, আমার মামার বাড়ীর। আমার দাদামশায় তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে হুগলী জেলায় নিজের গ্রামে এসে বসেচেন।

বামা মাকে ঠিক নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছিল। বাইরে কোথাও গেলে সন্ধ্যার পর পিছু-পিছু যেতো, মার বড় বয়সেও।

বামা কোথাও যেতো না, নিজের দেশ বর্ধমান জেলার যে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে তার পৈতৃক ভিটে, মার ভার নেওয়ার পর থেকে সে কখনো আর সে গ্রামেও পদার্পণ করে নি।

আমার মা যখন বিয়ের কনে সেজে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন—বামা তখন মার সঙ্গে এ বাড়ী চলে আসে এবং মাঝে মাঝে দেশে চলে গেলেও প্রায়ই তার এই জামাই-বাড়ী এসেই থাকতো।

মা বলতেন—এখানেই থাক না কেন বামা ?

সে বলতো—না খেঁদি (মার ডাকনাম), জামাই-বাড়ী কি থাকতে আছে ? লজ্জার কথা।

সে কিন্তু মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারতো না—কিছু দিন পর-পর প্রায়ই আসতো। আসবার সময়, মা যা খেতে ভালবাসতেন ছেলেবেলায়—নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে, কলা, এই সব যোগাড় করে নিয়ে আসতো। শুধু হাতে কখনো আসে নি !

বামা কিন্তু মারা যায় আমার মামার বাড়ীতেই, হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে। মার সঙ্গে দেখা হয় নি। মার সেজন্যে খুব দুঃখ হয়েছিল। আমাদের কাছে পর্যন্ত বামার নাম করতেন আর চোখের জল ফেলতেন।

আমি বললাম—আপনি বামাকে দেখেছিলেন ?

—না, আমার দাদা দেখেছিলেন, তখন দাদার ছ-সাত বছর বয়েস।

—তারপর ?

—তারপর কর্ম উপলক্ষে বাবা মা উগাণ্ডা চলে গেলেন এবং সে দেশেই বাস করতে লাগলেন। আমরাও গেলাম, ক্রমে বড় হলাম সে দেশে। বাবার চাকরির উন্নতি হোল। আমার এক বোনের বিয়ে হোল মোম্বাসায়, সেখানে হুগলী জেলার বন্দীপুরের রামতারণ

চক্রবর্তী শিপিং কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতেন, তাঁর বড় ছেলে শিবনাথ আমার ভগ্নীপতি।

পরের বৎসর আমার মা মারা গেলেন।

আমার বোনের বিয়ের আগে থেকেই তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন শরীরটা কেমন করচে।

তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেলেন।

এইবার আসল কথাটা এসে গিয়েছে।

মা তো মারা গেলেন সন্ধ্যার সময়। অনেক রাতে লোকজন যোগাড় হোল। যে কটি বাঙালী পরিবার নাইরোবিতে সে সময় থাকতো, তাদের সকলের বাড়ী থেকেই মেয়েরা ও পুরুষেরা এলেন সে রাত্রে আমাদের বাড়ী খবর পেয়ে। রাত এগারোটার পর আমরা শ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে গেলাম।

নাইরোবির বাইরে শহর থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় নদীর ধারে শ্মশান। স্থানটা বড় নির্জন ও ঘাসের জঙ্গলে ভরা। রাত্রে এ সব স্থানে সিংহের ভয় ছিল খুব বেশী। সিংহের উপদ্রবে রাতে কেউ বড় একটা মড়া নিয়ে যেতে সাহস করতো না শ্মশানে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল। আলো জেবলে ও বন্দুক নিয়ে আমাদের দল মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে গেল।

মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হয়েচে, দাদা মুখাগ্নি করলেন, আমরা সবাই চিতার অদূরে বসে আছি। এমন সময় আমার ছোট ভাই দেবু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ দেখো, ও কে দাদা!

আমি চেয়ে দেখলাম। শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা গাছতলায় একজন ভারতীয় বৃদ্ধা মহিলা চুপ করে বসে একদৃষ্টে চিতার দিকে চেয়ে আছে। পরণে তার আধময়লা থান কাপড়।

বাবা সেদিকে চেয়ে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! ও যে বামা ঝি।

দাদা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বামা দিদিমার মত দেখতে বটে।

বাবা বললেন—তোর মনে আছে?

—একটু একটু মনে পড়ে বাবা।

আমরা সবাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম। সত্যি, এই গভীর রাতে এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল শ্মশানভূমিতে কোন বাঙালীর মেয়ে আসবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমরা কেউ তাকে চিনিও না। কেবল চেনেন বাবা এবং সামান্য কিছু চেনে দাদা। তাদের সাক্ষ্য সেখানে সেদিন গভীর এক তত্ত্বের অবতারণা করলে। কোথায় বা চিতা, কার বা মৃতদেহ, মৃত্যুই বা কার?

বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীমূর্তি কিন্তু আমাদের দিকে লক্ষ্য করে নি। সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীনভাবে একদৃষ্টে জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে ছিল। এখনো সে ছবি আমি দেখচি যেন চোখের সামনে। চিরকাল আঁকা থাকবে সে ছবি আমার মনের পটে।

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহের টানে আজ বিশ বছর পরে বামা ঝি চলে এল পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির শ্মশানভূমিতে।

বেশিক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। সবসুদ্ধ বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয় হবে বামা ঝিকে আমরা দেখতে পেয়েছিলুম সবাই মিলে। তার পরই মিলিয়ে গেল সে মূর্তি।

আমরা বেশী কিছু কথা বলি নি এর পর। দাহকার্য শেষ করতে সকাল হয়ে গেল। নদীতে স্নান করে আমরা বাড়ী ফিরে এলুম তখন বেলা সাতটা সাড়ে সাতটা। ওই নদীর তীরেই আমার মার দশাপিণ্ড দেওয়া হয় এর দশ দিন পরে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন রেল অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলী, নাইরোবির বাঙালীদের বাড়ীর মোটামুটি বিয়ে, পৈতে, ষষ্ঠীপুজো তিনিই করতেন। তাঁর নামই ছিল আমাদের মধ্যে 'পুরুতকাকা'।

নদীর ওপারে শৈলশ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

ছায়াছবি

এক বন্ধুর মুখে এ গল্প শোনা।

আমার বন্ধুটি অনেক দেশ বেড়িয়েচেন, লোক হিসেবে অমায়িক, রসিক ও শিক্ষিত। কলকাতাতেই থাকেন।

যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন গল্পে গল্পে অনেক সময় সারারাত কেটে যায়।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক মনের মত লোক পাওয়া বড় দুষ্কর। অনেক কষ্টে একজন হয়তো মেলে। অধিকাংশ লোকের সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়, সে সম্পূর্ণ মৌখিক। তাদের সঙ্গে আমাদের হয়তো ব্যক্তিগত অভ্যাসে, চরিত্রে, মতে, ধর্মবিশ্বাসে, বিদ্যায় যথেষ্ট তফাত। কিন্তু একই আফিসে কি কলেজে কি কোর্টে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, দু-বেলা দেখা হয়—দাদা কিংবা মামা বলে সম্বোধন করতে হয়, কৌটাস্থ পানের খিলির বিনিময়ও হয়তো হয়ে থাকে—কিন্তু ওই পর্যন্ত। মন সায় দিয়ে বলে না তার সঙ্গে দু বেলা দেখা হোলে গল্প করে বাঁচি। কোনো নিরালা বাদলার দিনে আফিসের হরিপদ-দার সঙ্গ খুব কাম্য বলে মনে হবে না।

আমার বন্ধুর নাম—থাক গে, নামের দরকারই বা কি? আবার লোকে তাঁকে বিরক্ত করবে। কৌতূহলী লোকের সংখ্যা সর্বত্রই বেশি। কোনো কাজ নেই—গিয়ে আনন্দ করবে আর বকবক বকাবে। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। হাতে পয়সা এবং কলকাতায় বাড়ী আছে। বাড়ীর গ্যারেজে মোটর গাড়ী থাকবার অন্য কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধু আড়ম্বর ও বিলাসিতা পছন্দ করেন না।

ভূমিকা এই পর্যন্ত।

সেদিন খুব বর্ষার দিন। একা বাড়ী বসে বসে ভালো লাগলো না। একখানা ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌঁছুলাম। ভীষণ বর্ষায় ট্রাম বন্ধ। বাস ক্বচিৎ দু-একখানা চলচে। জল ভেঙে হেঁটে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছুলাম।

বন্ধু আমায় দেখে অত্যন্ত খুশি হোলেন বলাই বাহুল্য। তখনই গরম চা ও খাবারের ব্যবস্থা হোল। পরস্পরের কুশল-জিজ্ঞাসার ভদ্রতা বাদ গেল না। তাঁর বৈঠকখানার গদিআঁটা আরাম কেদারায় ততক্ষণ বেশ হাত-পা এলিয়ে বসে পড়েছি।

সন্ধ্যার পরে আবার সজোরে বৃষ্টি নামলো। বেশি ঠাণ্ডাবোধ হওয়াতে পাখা বন্ধ করতে হোল।

বন্ধুর আতিথেয়তা আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন—ঘরে স্টোভ আছে, চলুন দোতলার ঘরে। এই বৃষ্টিতে আর কেউ আসবে না। খিচুড়ি চড়িয়ে দিই। ডিম আছে, আলু আছে—

—চমৎকার।

—মাছ দেখতে পাঠাবো রঘুয়াকে?

—কোনো দরকার নেই। আমাদের ওতেই হয়ে যাবে।

—চলুন ওপরের ঘরে। রাতে এখানে খাবেন এবং থাকবেন।

—নইলে আর যাচ্ছি কোথায়?

—যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হবে না।

ওপরের বসবার ঘরটিতে বন্ধুর লাইব্রেরী। দেওয়ালের গায়ে সারি দেওয়া কাঁচের আলমারি, সাধারণতঃ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে বড়-বড় অয়েল পেণ্টিং—প্রতিকৃতি নয়—সবই ল্যাণ্ডস্কেপ। ভাল চিত্রকরের হিমালয় অঞ্চলের দৃশ্য। আমার বন্ধু হিমালয়কে অত্যন্ত ভালবাসেন। হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। অনেকদিন রাত্রে হিমালয় ভ্রমণের নানা মনোরম গল্পে রাত্রি কখন কেটে

গিয়েচে, টেরও পাই নি।

ওপরের ঘরে যখন গিয়ে বসলুম, তখন টেবিলের ওপর একখানা ছবিওয়ালা বই খোলা পড়ে আছে। বন্ধু হাতে নিয়ে বললেন—এখানা দেখেচেন? হিমালয়ান জর্নাল। সোয়েন হেডিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেরিয়েচে।

—কোথাকার?

—কাশ্মীর।

—এমন শৌখীন স্থানে সোয়েন হেডিন বেড়াতেন বলে তো জানতাম না! কোথায় তাক্‌লা মাকান্‌, কোথায় কারাকোরম—এ সব দূর দুর্গম স্থান ছাড়া তিনি—

—না। চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করেচেন এ লেখাটায়, দেখবেন।

—দেখবার চোখ ছিল ভদ্রলোকের—যা সকলের থাকে না।

—একশো বার সত্যি।

তারপর আমাদের গল্প আরম্ভ হোল প্রধানতঃ কাশ্মীর নিয়েই। কাশ্মীর আমার বন্ধুটির জীবনের একটি তীর্থক্ষেত্র—অনেকবার তিনি ক্লান্ত নাগরিকের মন ও চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বেরুতেন আমি জানি। কাশ্মীরেও গিয়েচেন অনেকবার। কাশ্মীরের কথায় সাধারণতঃ তিনি পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। এবার কিন্তু একটা নতুন বিষয় নিয়ে তিনি কথা পাড়লেন। সেটা হোল তাঁর একটি অতি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা, যেটা কাশ্মীরের পথেই ঘটেছিল।

বন্ধু বললেনঃ

সেবার পুজোর পরে আমার বাল্য-সুহৃদ রতিকান্ত মৈত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তারই মোটরে দু'জনে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। রতিকান্ত প্রতিবৎসর নিজের মোটর নিয়ে গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে কোথাও না কোথাও যাবে। এবার আমারই কথায় সে কাশ্মীর রওনা হোল। পথের আনন্দ ও কষ্ট ভোগ করতে করতে আমরা দিল্লী গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানে দিন দুই বিশ্রাম করে আমরা আবার মোটর ছাড়লুম।

বাকি পথটুকু বেশ কাটলো। সে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে করবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

কোহালায় পৌঁছুলাম দিল্লী থেকে রওনা হবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার দিকে। মোটর থামিয়ে কোহালার বাজারে একটি চায়ের দোকানে চা পান করতে বসলাম দু-জনে। গাড়ীতে রইল ক্লিনার রামদীন ও ভৃত্য নাথু বাগ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামটি অবাঙালীর মত শোনালেও প্রকৃতপক্ষে ওর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এবং সে বাঙলা ছাড়া অন্য প্রদেশের ভাষা জানে না।

চা পানের সময় দোকানদারকে আমাদের রাত্রির জন্যে একটু বিশ্রামস্থানের সন্ধান দিতে বললাম। সে দু-একটা সন্ধান দিলে। বড় পরিশ্রান্ত ছিলাম সেদিনটা। রাত্রিটাতে একটু ভাল ঘুমের দরকার। নাথুকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে (কারণ তার দ্বারা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই পাওয়া সম্ভব নয়) রামদীন ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাসার সন্ধানে বার হই।

রতিকান্ত বললে—গাড়ীর একটা আস্তানাও তো খুঁজতে হবে?

আমি বললাম—খুঁজে পেলে ভাল হয়। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। নাথু তো শীতে জমে যাবে গাড়ীতে থাকলে বাইরে।

—রামদীন বরং পারে।

রামদীন বললে—হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া নেহি হুজুর—

কিন্তু বাসা কোথাও পাওয়া গেল না। কোহালা বড় জায়গা নয়। বাজারের সরাই-গুলো পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভিড়ে পরিপূর্ণ। একখানা দোকানের পেছনদিকে একটা ঘর আছে বটে, দোকানদার দেখালে।—কিন্তু সে ঘর এত অপরিষ্কার ও আলোবাতাস-হীন যে, সে ঘরে রাত্রি কাটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া সে ঘরে বিশ্রাম করতে গেলে মোটর বাইরে পড়ে থাকে। রামদীন মুখে বলেছে বলেই তাকে হিমবর্ষী রাত্রে বাইরে শুইয়ে

রাখা যায় না।

রতিকান্ত বললে—উপায়?,

আমি এর আর কি উপায় বলবো!

পরামর্শ করা গেল সেই চায়ের দোকানীর কাছে আবার যেতে হবে। তাকে গিয়ে এমনভাবে ধরা হোল যেন এই পার্বত্য দেশে সে-ই আমাদের একমাত্র রক্ষক ও অভিভাবক। তারই মুখ চেয়ে আমরা বাড়ী থেকে এই দু-হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে এসেচি।

দোকানদার লোক ভালো। সে বলে দিলে বাজারের পেছন দিয়ে যে পথটা ছোট্ট পাহাড়টা ডিঙিয়ে চলে গেল, ওরই ওপারে এক বৃদ্ধ জাঠের বাড়ী। সে বাড়ীতে অনেক সময় লোকজনদের আশ্রয় দেয়।

আমরা দু'জনে দোকানদারের কথামত সেখানে গেলাম।

বাড়ীখানা কাঠের দোতলা। দেখে মনে হয়, এক সময়ে বাড়ীর মালিকের অবস্থা ভালই ছিল।

আমাদের ডাকাডাকিতে একজন বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা লম্বা সুপুরুষ ব্যক্তি দোর খুলে রুক্ষস্বরে জিগ্যেস করলে—কিস লিয়ে হল্লা মচাতে হো? কৌন হ্যায় তুম্ লোক?

আমরা বিনীতভাবে আমাদের আসবার কারণ ব্যক্ত করলাম। আমরা নিরীহ পথিক, কোনো গোলমাল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বৃদ্ধ বললে—কোথা থেকে আসচ তোমরা?

অবশ্য হিন্দীতেই বলেছিল কথা।

আমরা বললাম কলকাতা থেকে।

—ঘরভাড়া আমি দিই না।

—মেহেরবানি করে একটু জায়গা দিতেই হবে।

—কে বললে এখানে জায়গা আছে?

—বাজারে শুনলাম।

—আমি ঘরভাড়া দিই না।

—ভাড়া না দেন, একটু আশ্রয় দিন।

বৃদ্ধ একটুখানি কি ভেবে বললে—কজন লোক?

—চার জন। তবে একজন মোটরে শুয়ে থাকবে বাজারে।

—একখানা ঘরের বেশি দিতে পারবো না।

—তাই আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবো।

—আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম লোকটি আমাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক আছে বলে আমাদের মনে হোল না। সিঁড়ির বাম দিকের কোণের ঘরে সে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললে—এই ঘরটা আমি দিতে পারি। আর ঘর নেই। কারপেটখানা পেতে নেবেন। বাইরের টবে জল আছে। গরম জল দিতে পারব না—কিন্তু—বলেই লোকটা চুপ করে গেল।

আমাদের ভয় হোল পাছে সে আবার মত বদলায়।

আমরা উভয়েই জোর করে বললাম—আপনার খুব মেহেরবানি। চমৎকার ঘরটি।

—জিনিসপত্র কোথায়?

—মোটরেই আছে। আরও দু-জন লোক মোটরে আছে। তদের একজনকে নিয়ে আসি।

—কি খাবেন রাত্রে? এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না।

—কোন দরকার নেই। আমরা দোকান থেকে আনিয়ে নেবো। চলুন, আমরাও নিচে যাই। বাজারে যাবো।

আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার এসে ঘরে বিছানাপত্র পেতে নিলাম। রামদীন মোটরেই রইলো। রতিকান্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। তারই অনুরোধে আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, তারপর আমি নিজে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

বাজারের রাস্তা সামনের ছোট পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যে উপত্যকায় নেমেছে, তারই

এপারে এই ছোট্ট দোতলা কাঠের বাড়ীটি। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেচে, সামনের নিম্ন-ভূমি অর্থাৎ উপত্যকায় বেঁটে ওক, চেনার ও সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব শোভা। বাতাস বেশ শীতল। আমার যেন চোখে ঘুম আসচে না, এই সুন্দর বনাবৃত উপত্যকার শান্ত কুটিরখানি সারারাত্রি জেগে ভোগ করি এই যেন আমার মনের গূঢ় বাণী। কিন্তু শরীর মানলো না। পথক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছিল শয্যায়। অগত্যা শয্যা আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলাম। কি একটা শব্দ যেন আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছি, তাতেই ঘুম ভেঙেচে। শব্দটা তখনও হচ্চে, আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়লো নিম্নের উপত্যকার বনভূমির দিকে। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়ল যাতে আমি পাথরের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। চাঁদ হেলে পড়েচে পশ্চিম আকাশে, তারই সুস্পষ্ট আলোতে দেখি একটি নারীমূর্তি আমার সামনের কি একটা বড় গাছের ডালে দোল্না বেঁধে দোল খাচ্ছে।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম। হ্যাঁ নারীই বটে, সুন্দরী নারী। বাইশ-তেইশের মধ্যে বয়স।

কিন্তু মেয়েটির দোল খাওয়ার স্থান—বিশেষ করে সময়, আমার কাছে বড় আশ্চর্য বলে মনে হোল। কাশ্মীরের দিকে কখনো আসি নি। এখানকার মেয়েরা এই হিমবর্ষী রাত্রের শেষ প্রহরে বনে এমন ভাবে দোলনা টাঙিয়ে দোল খায় নাকি?...

দৃশ্যটা যদি শুধু সুন্দর হোতো—সুন্দর সন্দেহ নেই—তাহলে আমি এমন অস্বস্তি বোধ করবো কেন? আমার যেন মনে হোল এই দৃশ্যের মধ্যে একটি জিনিস আছে—যা অশিব, যা নিয়মের বিপরীত, যা অমানুষী!—

তাড়াতাড়ি রতিকান্তকে ডাকলুম। সেও যখন বাইরে এল, তখনও মেয়েটি দোল খাচ্ছে।

রতিকান্তকে বললাম—ও কে ভাই?

সে অবাক হয়ে গিয়েছে। চোখ রগড়ে বললে—তাই তো!

—এখানকার মেয়েরা ওরকম করে নাকি?

—তা কি জানি?

হঠাৎ রতিকান্ত বলে উঠলো—ওকি! দোল্নায় দড়ি কই? গাছে টাঙিয়েচে কি দিয়ে? ভাল করে চেয়ে দেখলাম, সত্যই তো দোলনার দড়ি অস্পষ্ট এত যে চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছে না। সরু তার হোলেও দেখা যাবে এ আলোতে। কিন্তু তার বা দড়ি কিচ্ছু নেই—শূন্যে ঝুলচে দোল্না! আরও একটা ব্যাপার যা এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম—আমাদের দিকে অল্প দূরেই গাছটার তলায় এ ব্যাপার ঘটচে, অথচ কোন রকম শব্দ আমাদের কানে আসচে না। সবসুদ্ধ মিলিয়ে যেন একটা ছবি।

রতিকান্ত বললে—ভাই, বাড়ীওয়ালাকে ডাকবো?

—ডাকো।

—আবার এরই কেউ না হয়—তাহোলে হয়তো চটে যাবে।

—তুমি ডাকো। যা হয় হবে।

কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিলাম দুজনে বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড। পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি কোথায় সেই দোদুল্যমানা তরুণী নারী-মূর্তি! কিছুই নেই সে গাছের তলায়। ওই তো সেই বাঁকা ডালটা, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠচে গাছটার শুভ্র কাণ্ড; পাশের বেঁটে ওক গাছটা তেমনি দেখা যাচ্চে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই, গাছের তলা একদম ফাঁকা।

রতিকান্ত বললে—ওকি কোথায় গেল?

—তাই তো!

—আশে-পাশে নেই তো?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেউ পালাতে পারে না—আমাদের দু'জনের চোখ এড়িয়ে এই জ্যোৎস্নালোকিত উপত্যকা থেকে। যাবার আর কোনো রাস্তা নেই, বাজারে যাবার ওই সঙ্গে পায়ে চলার পড় ছাড়া। পেছনে উঁচু পাহাড়টা। বনের নিচে আগাছার জঙ্গল নেই বাংলাদেশের মত—বেশ পরিষ্কার তলা দেখা যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। সম্ভব নয়, কোথাও লুকানো বা পালানো আমাদের চোখ এড়িয়ে—এত অল্প সময়ের মধ্যে।

রতিকান্ত বললে—ব্যাপার কি?

—তাই তো আমিও ভাবচি!

—এ দেখচি একেবারে ম্যাজিক—

—সেই রকমই মনে হচ্চে!

—কি করা যাবে এখন?

—শোয়া ও ঘুমুনো।

রাত বড় বেশি ছিল না। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে রতিকান্ত ও আমি দেখি নাথুর তখনও নাক ডাকচে। ওকে উঠিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলে আমরা আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ালুম। ওই সেই গাছটা, ওই সেই বাঁকা ডালটা। সত্যি সত্যি কাল শেষ রাতের দিকে আমরা দু'জনে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখেচি কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছেই মনে হচ্চে ওটা আসলে ঘটে নি, হয়তো রাত্রির স্বপ্ন।

স্বপ্ন? কি জানি?

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা মোটরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দোকানী বন্ধু চেরা সরল কাঠের ডাল উনুনে দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করচে। আমাদের দেখে বললে—কি, জব্বর ঘুম হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি তো?

আমি যেন দোকানীর কথার সুরে ও দৃষ্টিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন লক্ষ্য করলুম।

আমরা চা দিতে বলে ওর দোকানের সামনে জাঁকিয়ে বসে রাত্রের ঘটনা সবিস্তারে ওকে বর্ণনা করলাম।

দোকানী ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—জানি বাবুজি। এই জন্যেই ও বাড়ীর সন্ধান আপনাদের দিতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ওই বনে জ্যোৎস্নারাতে কত লোক ও মেয়েটিকে দুলতে দেখেচে। ও মানুষ নয় জিন, আফরিট্, হুরী—

বলে হাত নেড়ে যেন সব জিনিসটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আপনারা আজই কোহালা ছেড়ে চলে যান। আমি জানি যারা ওই খুবসুরত জিন হুরীর মোহে পড়ে ওই কাঠের ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন থেকে গিয়েচে—শেষকালে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। একবার একটি আত্মহত্যাও ঘটেছিল। বেশিদিন থাকলেই বিপদে পড়ে যাবেন। বাড়ীওয়ালা বুড়ো ওই জন্যেই আজকাল বাড়ীভাড়া দিতে চায় না।

আমরা বললাম—তোমরা তো স্থানীয় লোক, তোমরা দেখতে পাও?

—রোজ কি জিন, আফরিট্‌দের নজরে পড়ে? দু-মাস হয়তো কিছুই না, একদিন হয়ে গেল। কানুন কিছু নেই। তবে কানুনের মধ্যে এই চাঁদনি রাত হওয়া চাই আর রাতের শেষ প্রহর চাই। এখানকার লোকেরা সাঁঝ জ্বালার পর ও-পথে বড় একটা যাতায়াত করে না।.....

—হ্যাঁ, এক রুপেয়া সাড়ে সাত আনা হুজুর। আদাব হুজুর।

চন্দ্রনাথবাবু কবিরাজ এবং শিশির সেন তরুণ ডাক্তার। রামদাসের ছোট্ট বাজার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি! তবে দেশটায় রোগ-বালাই নিতান্ত কমও নয়, তাই সবাই দু-মুঠো ভাতের যোগাড় করতে পারতো কোনোরকমে। চন্দ্রনাথবাবুর বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, শিশির সেনের বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। ওদের ডাক্তারখানা রাস্তার এপার-ওপার। রোগী-পত্তর প্রায়ই থাকে না, দু'জনে বসে গল্প-সল্প করে। বয়সের তারতম্য যতই থাকুক, দু'জনে খুব বন্ধুত্ব। চন্দ্রনাথবাবু এসেচেন খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া থেকে আর শিশিরবাবু যশোর শহর থেকে।

কাজকর্ম না থাকলে যা হয়ে থাকে, দু'জনে বসলেই তর্ক আর দ্বন্দ্ব। তর্কের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ মানুষের মৃত্যুর পর কি হয়, এই নিয়ে।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তাঁদের গ্রামের একজন সাধু ছিলেন, তিনি ভূত নামাতে পারতেন। অনেকবার তিনি ভূতনামানো-চক্রে উপস্থিত ছিলেন, নিজের চোখে ভূতের আবির্ভাব দেখেচেন, ভূতের কথা শুনেচেন নিজের কানে। সাধুটি একজন বড় মিডিয়ম, তাঁর মধ্যে নাকি ভূতের দল পৃথিবীতে নিজেদের প্রকাশ করে!

শিশির সেন বলেন—রাবিশ!

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তোমার বলবার কোনো অধিকারই নেই এখানে! তুমি ছেলে-মানুষ, কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা?

—অভিজ্ঞতার কোনো দরকার হয় না, কমন-সেন্সের প্রশ্ন এটা।

—কাকে বলচো কমন-সেন্স?

—মানুষ মরে গেলে আর বেঁচে থাকে না, কমন-সেন্স। মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা।

—মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে জীনটা বড় করে পাওয়া।

—একদম বাজে।

—দু-পাতা সায়েন্স পড়ে ভাবচো খুব সায়েন্স শিখে ফেলেচো? আসল সায়েন্সের কিছুই জানো না, শেখো নি।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বছরের মত এমন গরম এখানকার বৃদ্ধ লোকেরাও সেখানে কোনোদিন দেখে নি।

শিশির সেন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এসে ডাক্তারখানা খুললেন। নাঃ, টিনের বারান্দা তেতে আগুন হয়েচে, এখনো ঘরের ভেতর বসা সম্ভব নয়।

সামনের পানের দোকানীকে বললেন—রাস্তাটাতে একটু জল ছিটিয়ে দিও অভয়—এখুনি লরী গেলে ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার করে দেবে।

—ও কোবরেজ-মশায়!

—কি?

—বাইরে আসুন না!

—যাই।

—কতক্ষণ এলেন?

—আমি আজ বাসায় যাই নি—দুপুরে এখানেই শুয়েছিলাম।

—খেলেন কোথায়?

—রামজীবন তরফদা'রর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ গেল আজ কিনা। নেমন্তন্ন ছিল।

—হুঁ। আসুন আমার বারান্দায়, চা খাবেন?

—ন' মশায়। এই গরমে চা? দুপুরে লুচি ঠেসে?

—দালদা ঘি-এর তো?

—নইলে আর কোথায় পাচ্চে গাওয়া ঘি?

—না মশাই, ও নেমন্তন্ন না খেয়ে ভালোই করেচি। খেলে অম্বল, না হয় পেটের অসুখ। আর এই গরমে!

চন্দ্রনাথবাবু ডাক্তার সেনের বারান্দায় এসে বসলেন এবং চাও খেলেন। পরে যথারীতি ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেল।

চন্দ্রনাথবাবুর মধ্যে একটি সমরপটু আত্মা বাস করে, অবিশ্বাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাঁর তৃপ্তি। শিশির সেন ভূতে বিশ্বাস করুক, না করুক, তাতে চন্দ্রনাথ কবিরাজের কি? জিনিসটা যদি সত্যিই হয়, তবে শিশির সেনের অবিশ্বাস সেটার কি হানি করতে পারে?

চন্দ্রনাথবাবু সেটা বোঝেন না যে এমন নয়, বোঝেন সবই। তবু যদি একজন অবিশ্বাসীকেও একদিন আলোতে এনে হাজির করা যায়! ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রচারকদের আশা যেন তাঁর মধ্যে এসে বাসা বেঁধেচে। সত্যের আলোতে এসব অসৎ মূর্খ ছেলে-ছোকরাদের আনতেই হবে, তবেই প্রকৃত শাস্তি দেওয়া হবে এই দাম্ভিকদের। স্বার্থবাদী ছোকরা দাম্ভিকের দল। দু-পাতা সায়েন্স পড়ে সব শিখে ফেলেচে।

চন্দ্রনাথবাবু জানতেন না শিশির সেনের মত ছোকরা তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করে। ওরা আড়ালে মুখ টিপে হেসে বলে—বুড়ো একদম সেকেলে। কুসংস্কারে ভরা। ইংরাজি তো তেমন জানে না। কবরেজি করতো, সংস্কৃত জানে একটু-আধটু। দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর। কি করি, মেশবার কোনো লোক নেই এসব জায়গায়। কার সঙ্গে দুটো কথা বলি? নইলে ওই বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার? রামঃ!

একটু পরে হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে অন্ধকার করে একখানা বড় কালো মেঘ উঠলো এবং কিছুক্ষণ পরে কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ কবিরাজ নিজের কবরেজখানার জানলা দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেলেন। ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠলো, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হলো বটে কিন্তু বৃষ্টি বেশি না হয়ে ঝড়টাই হলো বেশি।

ডাক্তারখানার সামনের অশথ-গাছের একটা ডাল ভেঙে উড়ে এসে পড়লো শিশির সেনের ডাক্তারখানার দরজার সামনে। বৃষ্টি-ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঠান্ডা—গরম একদম কমে এল।

চন্দ্রনাথ বললেন—আঃ বাঁচা গেল! শরীর জুড়িয়ে গেল যেন! কতদিন পরে একটু বৃষ্টি পড়লো আজ মাটিতে।

—চা খাবেন একটু?

—তা হলে মন্দ হয় না। আনাও আর একটু।

এই সময় বৃষ্টিটা বেশ জোরেই এল। বর্ষাকালের বৃষ্টির মত।

চন্দ্রনাথ কবিরাজের কবরেজখানার ঘরের চালের ছাঁচ বেয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রাস্তায় জল জমে উঠলো আধ-ঘণ্টার ভেতর।

—বেশ বৃষ্টি হলো, মুষলধারে না হোলেও এ বছরের পক্ষে মন্দ নয়। চন্দ্রনাথবাবু বললেন—কই তোমার চা কোথায় গেল হে?

—নবীন তো গিয়েচে, বৃষ্টিতে আটকে পড়লো রামুর দোকানে। ছাতি আছে আপনার?

—নাঃ।

—তবে আর কি হবে? বসুন, জল ছেড়ে যাক।

—আপনার ভূতুড়ে আলোচনা আরম্ভ করুন না!

—নাঃ।

—কেন, আজ এত বিরাগ কেন? আজই বরং ঠান্ডা বাদলায় সন্ধেতে এ-কথা জমবে ভালো।

—না হে, তোমরা অবিশ্বাস কর হাসাহাসি কর, গভীর সত্যকে এভাবে বেনা-বনে ছড়াতে নেই।

—আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হতে হচ্চে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে। গভীর

সত্য কাকে বলচেন আপনি?

—মানুষের জীবন ও মৃত্যু অদ্ভুত রহস্যময়। গভীর রহস্য দিয়ে ঘেরা আমাদের এই জীবন। মানুষ মরে না। ভগবান অনন্ত করুণার আকর। এই হ'লো গভীর সত্য। আরো সংক্ষেপে শুনতে চাও? মানুষ অমর।

শিশির সেন হেসে বলে উঠলেন—তবে আপনি কবরেজি করেন কেন? মানুষ যদি অমর তবে?

—তার এই দেহটা অমর নয়, তাই কবিরাজি করি। আর এতদিন পরে কথাটা বলি, কবিরাজি করতে গিয়েই এই সত্যটা টেরও পেয়েচি।

—কি ভাবে?

এই সময় নবীন চাকর ভিজতে-ভিজতে চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে।

শিশির সেন বললেন—বিস্কুট কই রে? আনিস নি? যা নিয়ে আয় চারখানা।

—আসুন! দুটো সিগারেট নিয়ে আয় অমনি। এইবার বলুন কি ভাবে?

চন্দ্রনাথ কবিরাজ চা খেতে খেতে গম্ভীর মুখে বললেন—নাঃ ও সব নিয়ে ঠাট্টা নয়। বাদ দাও।

—না না, রাগ করবেন না। কি করে সত্যটা টের পেলেন কবরেজি করতে গিয়ে বলুন না?—বেশ বাদলার সন্ধ্যেটা—

—না, আমি বলবো না। ঠাট্টার ব্যাপার নয় সেটা। তোমরা হাসবে আর আমি ভেবেচ আমার জীবনের অত বড় একটা অভিজ্ঞতা—

—আমি কবে আপনাকে ঠাট্টা করেচি এ নিয়ে? সত্যি বলুন!

চন্দ্রনাথ কবিরাজের মনটা যেন একটু নরম হয়ে এল। তিনি চা খেতে-খেতে শুরু করলেন নিম্নের গল্পটি।

—আমি নিজে যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করি কি করে? ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। পাকিস্তানে আমার বাড়ী ছিল খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া গ্রামে। আমার বাবার নাম ছিল ত্রিপুরাচরণ শাস্ত্রী, সেকালের বড় নামডাকওয়ালা কবিরাজ ছিলেন তিনি।

বাবা বড় কবিরাজ ছিলেন, তাঁর পসার পেলাম আমি। বাবা তখনো বেঁচেই আছেন. তবে কাজকর্ম করেন না। ইদানীং পক্ষাঘাত রোগে এক দিকের অঙ্গ অচল হয়ে গিয়ে শয্যাগত ছিলেন একেবারে। নাম-করা সেকেলে কবিরাজের ছেলে হিসেবে বড় বড় বাঁধা ঘর ছিল, যারা অসুখ-বিসুখে আমাকে ছাড়া আর কোনো চিকিৎসককে ডাকতো না।

মালমাজীর পাকড়াশী জমিদার ছিলেন এমন একটি বাঁধা ঘর। সেবার কার্তিক মাসের শেষে জমিদার হরিচরণ পাকড়াশী ডেকে পাঠালেন—তাঁর ছেলের অসুখ।

আমি গিয়ে দেখলাম ছেলেটির বিষম জ্বর, যাকে আপনারা বলেন টাইফয়েড। পনেরো-ষোল বছর বয়েসটা ও রোগের পক্ষে তত সুবিধাজনক নয়। আমাকে জমিদার বাবু হাতে ধরে অনুরোধ করে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে হবে কবিরাজ মশায়. যা লাগে আমি তাই আপনাকে দেবো। ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন।

আমি রোগীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পেট-ফাঁপা, বুকে সর্দি-কাশি, নাড়ির গতি আপনারা যাকে বলেন ইণ্টারমিটেণ্ট, ভুল বকা—সব খারাপ লক্ষণই বর্তমান। বাঁচানো বড়ই কঠিন।

ভগবান ধন্বন্তরীকে স্মরণ করে কাজে লেগে গেলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর নাড়ির অবস্থাটা ভালো করে আনলাম। পেট-ফাঁপাও অনেকটা কমে গেল। ভুল বকুনি খানিকটা কমলো। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে গেলাম রাত্রি এক প্রহরের পর!

পাকড়াশী জমিদারদের বাড়ী দো-মহলা। বাইরে একদিকে দোলমঞ্চ, নাটমন্দির আর গোবিন্দ-মন্দির। ডাইনে সদর-কাছারি আর মহাফেজখানা। মহাফেজখানার দক্ষিণে আমলাদের থাকবার কুটুরি সারি-সারি অনেকগুলি। আমলাদের বাসার পূর্বদিকে বড় পুকুর। এই পুকুরের তিন দিকে বাঁধানো ঘাট। পুব পাড়ের ঘাট বাইরের লোকদের জন্যে, বাকি দুটি ঘাট আমলাদের জন্যে।

বাইরের মহলের মাঝখানে সদর দেউড়ি, এই দেউড়ির দু-পাশে দুই বৈঠকখানা।

আমার বাসা নির্দিষ্ট হয়েছিল বাঁদিকের বৈঠকখানার পাশের বড় কুঠুরিতে।

সাদা ধবধবে চাদর পাতা, দুটো বড় তাকিয়া, মশারি খাটানো, চমৎকার বিছানো করে দিয়ে গিয়েচে বাড়ীর ঝি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমি বাইরে বসে অনেকক্ষণ রোগীর বিষয় চিন্তা করলাম, কাল সকালে কি কি অনুপান দরকার হবে, সেগুলো মনে মনে ঠিক করে রাখলাম। তারপর এসে শুয়ে পড়তে যাবো, এমন সময়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ দিয়ে কে একজন সাদা কাপড় পরা স্ত্রীলোক এদিকে আসচে।

রাত তখন অনেক। এত রাতে একা কে মেয়ে এদিকে আসচে বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি এসে দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার সে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। আমি ভাবলাম, আমলাদের বাড়ী থেকে যদি কোনো স্ত্রীলোক রোগীকে দেখতে আসে, তবে এত রাত্রে আসবে কেন? একাই বা আসবে কেন? ...ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো দেউড়িতে।

এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে আমার ডাক এলো—রোগীর অবস্থা খারাপ, শীগগির যেন যাই।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রোগীর শয্যার পাশে।

সত্যি রোগীর অবস্থা এত খারাপ হলো কি করে? দেড় ঘণ্টা আগেও দেখে গিয়েচি রোগী বেশ আরামে ঘুমুচ্চে, এখন তার জ্বর হঠাৎ বন্ধ নেমে গিয়েচে, অথচ চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল, নাড়ির অবস্থা খারাপ। জ্বর এত কম দেখে ঘাবড়ে গেলাম। বেজায় ঘামতে শুরু করেচে রোগী। মস্ত বড় সংকটজনক অবস্থার মুখে এসে পড়লো কেন এভাবে হঠাৎ?

তক্ষুনি কাজে লেগে যাই। আমিও ত্রিপুরা কবিরাজের ছেলে, উপযুক্ত গুরুর শিষ্য; দমবার পাত্র নই।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে রোগীকে চাঙ্গা করে তুলে শেষরাত্রে ক্লান্ত দেহে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম।

এক ঘুমে একেবারে বেলা আটটা। উঠে রোগী দেখে এলাম, বেশ অবস্থা, কোনো খারাপ উপসর্গ নেই।

সারাদিন এক ভাবেই কাটলো। রোগীর অবস্থা দেখে বাড়ীর সকলে খুব খুশি। আমার সারাদিনের মধ্যে বিশেষ কোনো খাটুনি নেই। দুপুরবেলা খুব ঘুম দিলাম। বিকেলে—এমন কি বড় পুকুরে মাছ ধরতে গেলাম আমলাদের মধ্যে একজন ভালো বর্শেলের সঙ্গে। সেরখানেক একটা পোনা মাছও ধরলাম। মনে খুব ফুর্তি।

সেদিন রাত্রে বাইরের ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময়ে দেখি দূরে মাঠের দিক থেকে যেন সেই স্ত্রীলোকটি এদিকে আসচে!

আজ সারাদিনের মধ্যে মেয়েটির কথা একবারও আমার মনে হয় নি। এখন আবার তাকে আসতে দেখে ভাবলাম ইনি নিশ্চয় এদের কোনো আত্মীয় হবেন, দূর গ্রাম থেকে দেখতে আসেন ঘরের কাজকর্ম সেরে। কিন্তু একা আসেন কেন?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কাল এই মেয়েটি রোগীকে দেখে চলে যাবার পরেই রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো দেখে আমার বুকের মধ্যেটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো কেন কি জানি! কান খাড়া করে রইলাম বাড়ীর দিকে।

আরামে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। ঘড়িতে ঠিক সে সময় বারোটা বাজলো।

হঠাৎ দরজার কাছে কি শব্দ হলো! মুখ তুলে দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচেন।

বেশ সুন্দরী, ধপধপে শাড়ী-পরা, চল্লিশের মধ্যে বয়েস, কপালে সিঁদুর।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুবার আগেই তিনি আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে

হুকুমের সুরে বলতে আরম্ভ করলেন—শোনো, তুমি এই ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না, তুমি বাড়ী যাও।

আমার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বেরুলো—কেন মা? আপনি কে?

আমার শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো! সমস্ত ঘরটা যেন ঘুরচে। কেন এমন হলো হঠাৎ কি জানি!

তিনি এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বললেন—শোনো, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না। একে আমি নিয়ে যাবো। এ আমার ছেলে। ওর বাবা আবার বিয়ে করেচেন আমার মৃত্যুর পর। সৎমা ওকে দেখতে পারে না। বহু অপমান হেনস্থা করে। আমি সব দেখতে পাই। আমার স্বামী অনেক কথা জানেন না, কিন্তু আমি সব জানি। আমি আমার ছেলেকে নিশ্চয় নিয়ে যাবো। কাল রাত্রেই নিয়ে যেতাম, তোমার জন্য পারি নি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। ওকে বাঁচাতে পারবে না।

আমার সাহস ফিরে এল।

হাত জোড় করে বললাম—মা, আমি বৈদ্য। আমার ধর্ম প্রাণ বাঁচানো। আমার ধর্ম থেকে আমি বিচ্যুতি হবো না কখনোই। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার। একটা প্রস্তাব আমি করি মা! জমিদারবাবুকে সব খুলে বলি। অসুখ সারবার পরে তিনি ছেলেকে যাতে কোনো ভালো স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে দ্যান, এ ব্যবস্থা আমি করবো। এ যাত্রা আপনি ওকে নিয়ে যাবেন না। যদি আবার ওর ওপর অত্যাচার হতে দ্যাখেন, তখন নিয়ে যাবেন আর আমিও আসবো না। দয়া করুন জমিদারবাবুকে। তিনি বড় ভালবাসেন এই ছেলেকে।

তিনি বললেন—বেশ তাই হবে। তবে যদি কোনো ভালো ব্যবস্থা না হয়, তবে এবার আমি ওকে নিয়ে যাবোই, মনে থাকে যেন।

তখনই যেন সে মূর্তি মিলিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক এল অন্দর থেকে, রোগীর অবস্থা খারাপ।

আমি তখনি ছুটে গেলাম। কাল যেমন অবস্থা ছিল, আজও ঠিক তাই। বরং একটু বেশি খারাপ। ভোর পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হোলো রোগীকে চাঙ্গা করতে।

সকালবেলা বাইরে যাওয়ার আগে জমিদারবাবুকে আমি নিভৃতে ডেকে বললাম—কিছু মনে করবেন না জমিদারবাবু, আপনি এই ছেলেটিকে বাঁচাতে চান তো?

জমিদারবাবু অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

তার মানে হচ্চে এই। আপনি জানেন না ওই ছেলেটির ওপর ওর সৎমা বড় অবিচার করেন। কাল ওর মা আমার কাছে এসেছিলেন—শুনুন তবে।

সব কথা খুলে বললাম। জমিদারবাবু প্রথমটা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

পরে বললেন—আমি কিছু কিছু জানি। বেশ এবার ও বেঁচে উঠুক, এর ব্যবস্থা আমি করবো, আপনাকে আমি কথা দিলাম। ও সেরে উঠুক, জানুয়ারি মাস থেকে যশোর জেলা-স্কুলের বোর্ডিং-এ ওকে আমি রাখবো।

—কেমন ঠিক তো? এবার কিছু হলে আমি বলে, কেউ আর ওকে বাঁচাতে পারবে না।

—আমি কথা দিচ্চি কবরেজ মশাই।

—বেশ। নির্ভয়ে থাকুন. আপনার ছেলে সেরে গিয়েচে। আগামী মঙ্গলবার ওকে পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আপনি পুরনো চাল কিছু এর মধ্যে যোগাড় করুন।

—পরের দিন জ্বর ছেড়ে গেলো রোগীর।

শিশির সেন একমনে গল্প শুনছিলেন।

বললেন—সেরে উঠলো!

—নিশ্চয়।

—আর কোনোদিন দেখেছিলেন তার মাকে?

—কোনোদিন না। সে ছেলে এখন কলকাতায় থাকে, কিসের ভাল ব্যবসা করে শুনেচি। জমিদারবাবু মারা গিয়েচেন। চললুম আমি, বৃষ্টি থেমেচে—ঘরে আলো

জ্বালি গে।

চন্দ্রনাথ কবিরাজ উঠে গেলেন।

রহস্য

আমার বন্ধুর মুখে শোনা এ গল্প। বন্ধুটি বর্তমানে কলকাতার কোন কলেজের প্রফেসার। বেশ বুদ্ধিমান, বিশেষ কোনরকম অনুভূতির ধার ধারেন না, উগ্র বৈষয়িকতা না থাকলেও জীবনকে উপভোগ করার আগ্রহ আছে, সে কৌশলও জানা আছে।

সেদিন রাত্রে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। নানারকম গল্প হচ্ছিল গরম চা ও আনুষঙ্গিক খাদ্যের সঙ্গে মজিয়ে। অবিশ্যি ভূতের গল্পই হচ্ছিল। আমার বন্ধু একটা গল্প বললেন, আশ্চর্য লাগল গল্পটা। একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক যখন এই গল্পটা করলেন তখন এর একটা মূল্য আছে ভেবেই এই গল্পটা বলছি। তাঁর নিজের কথাতেই বলি—

সেবার আমি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছি, অনার্স পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে দিন চার-পাঁচ ছুটি পাওয়া গেল। কিসের ছুটি তা আমার এতকাল পরে মনে নেই। ভবতারণ ঘোষাল বলে আমার এক বন্ধু ছিল, ওর বাড়ি ছিল বেলঘরেতে। ভবতারণ ক্লাসে খুব পান খেত, ক্লাসের বাইরে ঘন ঘন সিগারেট খেত, অশ্লীল কথাবার্তা বলত, লম্বা লম্বা কথা বলত, চালবাজির অন্ত ছিল না। তার আমার সঙ্গে খুব বনত, এইজন্যে যে আমি নিজেও একজন দস্তুরমত চালবাজ ছেলে ছিলাম তখন। এখন সেসব কথা ভাবলে হাসি পায়। তারপর যা বলছিলাম।

অনার্স পরীক্ষা শেষ হবার দিন ভবতারণ আমায় টেনে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। যাবার সময় ট্রেনে গেলুম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হল, কারণ ওদের বাড়িটা প্রায় গঙ্গার ধারের কাছে। কিছুক্ষণ ওর বাড়ি থেকে হঠাৎ কি একটা বিষয়ে ঘোর তর্কাতর্কি হল, ওর আর আমার মধ্যে। এমন চরমে উঠল সে তর্ক যে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম। হায় রে সে সব দিন! এই রোদ এই মেঘ—তখনকার জীবনে তাই ছিল স্বাভাবিক।

যাই হোক, আমি ভয়ানক রেগে ওদের বাড়ি থেকে সেই সন্ধ্যাবেলাই বেরিয়ে পড়লুম। এমন জায়গায় ভদ্রলোকের থাকতে আছে?

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বেয়ে হন্-হন্ করে হাঁটছি কলকাতা-মুখে। দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। মাঝে মাঝে এক-আধখানা মোটর দ্রুতবেগে চলেছে কলকাতার দিকে। সম্পূর্ণ নির্জন রাস্তা, একবার একটা মাতাল কুলি ছাড়া আর কোন লোকের দেখা পাইনি।

হঠাৎ আমার মনে হল এতটা রাস্তা একটানা হাঁটতে পারব না, একটু বিশ্রাম দরকার। ডাইনে বায়ে চাইতে চাইতে কিছুদূর গিয়ে একটা বাগান বাড়ি দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বাইরে থেকেই আমার মনে হয়েছিল এ বাগান-বাড়িতে লোকজন কেউ থাকে না, আছে হয়ত একটা-আধটা উড়ে মালী, তাকে দু-চারটি পয়সা দিলে বাগানের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম করতে দেবে এখন। নিশ্চয় একটা পুকুর আছে বাগানে, নিশ্চয় তার ঘাট বাঁধানো। এমন গ্রীষ্মের দিনে জ্যোৎস্না রাত্রে পুকুরের বাঁধা ঘাটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার আনন্দ অনেক দিন পরে হয়ত কপালে জুটে যাবে।

বাগানের মধ্যে ঢুকে মনে হল এ বাগানে লোকজন কেউ বাস করে না। ঘন ঘন কেউ আসেও না। লাল কাঁকরের পথগুলোর ওপরে এক হাত লম্বা উলু ঘাস, ফুলের খেত আর আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। আরও একটু অগ্রসর হয়ে মনে হল এ বাগান-বাড়ি খুব বড়লোকের, অন্তত যে সময়ে এ বাগান-বাড়ি তৈরি হয়েছিল সে সময়ে মালিকের অবস্থা ছিল খুব ভাল। সৌখীন রুচির পরিচয় আছে এর প্রত্যেকটি গাছপালায়, প্রত্যেকখানি ইঁটে, পাথরে। আগাছাভরা ফুলের ক্ষেতের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে পাথরের অপ্সরী

মূর্তি। দু-একটার হাত ভাঙা নাক ভাঙা, অনেক এমন অপ্সরী মূর্তি আছে বাগানের এদিকে ওদিকে। কোনটার পিঠ দেখা যাচ্ছে, কোনটার মুখ—ঝোপের আড়ালে আড়ালে। একটু দূর গিয়ে বাঁদিকের চওড়া পথ ধরলাম, পুকুরে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে। তবে, যে ধরনের পুকুর আশা করেছিলাম এ তা নয়। অনেক কালের পুরোনো পুকুর, বাঁধা ঘাট এক সময় ছিল। এখন তার মাঝামাঝি প্রকাণ্ড বড় ফাটল ধরেছে, রানার দু-পাশে বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে, সে ঘাটে নামাও যায় না সিঁড়ির সাহায্যে। এ রাত্রে তো সাপের ভয়ে সেদিকে যেতেই আমার সাহস হল না।

ঘাটের থেকে কিছু দূরে একখানা বেঞ্চি পাতা, ক্লান্ত শরীরে বেঞ্চির ওপরে শুতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। আমার তন্দ্রা যখন ছুটে গেল, তখন অনেক রাত। সামনের দিকে চাইতেই একটা অদ্ভুত সন্দেহ হল আমার মনে।

আমার বেঞ্চিখানা থেকে কিছু দূরে যে অপ্সরী মূর্তি আমার দিকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার দিকেই ঘুম ভেঙে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এতক্ষণ সে মূর্তিটা অন্য কি কাজ করছিল বা অন্যদিকে অন্যভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে জাগতে দেখেই সেটা চট্ করে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পূর্ববৎ ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অবাক হয়ে সোজা হয়ে বসলাম, চোখ মুছলাম ভাল করে। ঘুমের ঘোরে? কিন্তু তা বলে তো মনে হল না! আমি ঘুম ভেঙে স্পষ্টই দেখেছি, ও পুতুলটা কি একটা করতে যাচ্ছিল, আমার সাড়া পেয়ে সামলে নিয়েছে।

সমস্ত শরীর যেন অবশ, ভারি। ঘুমের ঘোর ভাল কাটে নি। রাস্তা হাঁটবার ইচ্ছে নেই মোটে। আবার সেই বেঞ্চিখানাতেই শুয়ে পড়লাম। শোয়া-মাত্র আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম আসবার পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু একটা কৌতূহল আমার মনে বার বার উঁকি দিয়েছে। পুতুলটা কী করতে যাচ্ছিল? আমায় ঘুম ভেঙে উঠতে দেখে কী করতে করতে ও সামলে গেল?

অনেক রাতের ঠাণ্ডা ফিরফিরে হাওয়ায় আমি গাঢ় ঘুমেই অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশের গাছপালার পেছনে। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। তবে পশ্চিম দিক থেকে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়েছে ফুলের ক্ষেতে আগাছার জঙ্গলে।

ঘুম ভেঙে উঠেই আমার মনে হল আমি প্রথম যখন এ বাগানে ঢুকি তখন বাগানে যা ছিল, এখন তা নেই। কোথায় কি একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে বাগানের। ঘুমের ঘোর যতই ভাঙতে লাগল আমার মনে এ ধারণা ততই বদ্ধমূল হতে লাগল। আগে যা ছিল তা এখন যেন নেই। কী একটা বদলে গিয়েছে। অথচ কি সেটা বুঝতে পারছিনে। কী বদলে গেল কোথায়? হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সামনে। চোখ ভাল করে মুছলাম। পরিবর্তন ওখানেই হয়েছে যেন। আগে যা ছিল, এখন তা নেই।

কিন্তু কী পরিবর্তন? কী বদলে গেল? এক মিনিট কি দেড় মিনিট কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে বিদ্যুতের স্রোতের মত বয়ে গিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও অবশ করে দিয়ে আসল সত্যটি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

ঐ উচ্চ বেদিটার ওপর বসানো সে অপ্সরী পুতুলটা কোথায় গেল? বেদিকা খালি পড়ে আছে। পুতুলটা নেই।

প্রথমটা যেন বিশ্বাস হল না। সত্যি কি ওখানে অপ্সরী মূর্তিটা ছিল? অন্য জায়গায় ছিল হয়ত। আমি ভুল দেখেছিলাম। তা কি কখনো হয়? পাথরের অত বড় পুতুলটা গভীর রাত্রে কে নিয়ে যাবে? আমারই ভুল।

কিন্তু এই অপ্সরী মূর্তিই তো অন্য দিকে চেয়ে কি একটা করতে যাচ্ছিল, আমি ঘুম ভেঙে দেখেছিলাম। এই বেদিটার ওপরেই সেই পুতুলটা ছিল। না থাকলে আমি এই বেঞ্চিতে শুয়ে দেখলাম কী করে? বেশ মনে আছে, প্রথম এই বেঞ্চিতে শুয়ে পুতুলটা প্রথম আমার চোখে পড়েছিল। আমার দিকে ওর পাশ ফেরানো ছিল। এও ভাবলাম আমার মনে আছে, এ ধরনের পুতুল কি ইটালি থেকে আসে? না, এ দেশে তৈরী হয়?

এত সব একেবারে ভুল হয়ে যাবে? কিন্তু তা যদি না হয়, তবে সে অপ্সরী মূর্তিই বা যাবে কোথায়? এত রাত্রে কে উঠিয়ে নিয়ে গেল মূর্তিটা? চোরে নিয়ে গেল?

তাই যদি হয়, এতকাল এ বাগান অরক্ষিত ভাবে পড়ে আছে, এতদিন কেউ চুরি করলে না, আর একজন জলজ্যান্ত মানুষ শুয়ে আছে সামনের বেঞ্চিতে, আজই চোর এসে এত বড় ভারি মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যাবে?

না। তাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

কেন জানি না, আমার কেমন ভয় হল। গা ছম-ছম করতে লাগল। রাত আর বেশি নেই। এ বাগানে আর শুয়ে থাকার দরকার নেই। আস্তে আস্তে কলকাতা-মুখো হাঁটা দি।

যেমন এ কথা মনে আসা, অমনি আমি বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লাম। পুকুরের ঘাটে নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে নেব বলে ঘাটের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় আবার অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাঁধা ঘাটের ঠিক ওপরেই আমলকি-তলায় যে স্ট্যাচুটা ছিল, সেটাই বা কই? সেটার হাত ভাঙা ছিল বলে আরও বেশি করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐ তো তার শূন্য বেদীটা পড়ে আছে।

মনে কেমন সন্দেহ হল। বাগানের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। কত পুতুল ছিল এখানে ওখানে। বনের ঝোপের মধ্যে, আড়ালে আড়ালে। সাদা পাথরের পুতুলগুলো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঝক-ঝক করছিল। এখানে তেমনি সাদা জ্যোৎস্না বাগানের সর্বত্র, কিন্তু কই সে অপ্সরী পুতুলগুলো? একটাও তো নেই!

এক রাত্রে কি বাগানের সব পুতুল চুরি গেল? এই রাত্রিটার জন্যেই কি চোরেরা ওত পেতে বসে ছিল?

আশ্চর্য! বোকার মত চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, ঘুম ভেঙে উঠে যে ভাবছিলাম বাগানের কোথায় কি পরিবর্তন হয়েছে, সে হল এই পরিবর্তন। বাগানময় এই মস্ত পরিবর্তনটা সাধিত হয়েছে আমার ঘুমের মধ্যে।

ততক্ষণে পায়ে পায়ে আমি গিয়ে পুকুরের বাঁধা ঘাটের ওপরটাতে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ পুকুরের জলের দিকে চাইতে আমার কেমন যেন হয়ে গেল। সারা শরীর ডোল দিয়ে উঠল ভয়ে, বিস্ময়ে।

বাগানের সব অপ্সরী পুতুলগুলো জলে নেমে সাঁতার দিচ্ছে, দিব্যি সাঁতার দিচ্ছে, এপার ওপার যাচ্ছে—কিন্তু একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সেগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। আড়ষ্টভাবেই, পুতুল রূপেই সাঁতার দিচ্ছে!

এইখানে আমাদের মধ্যে বন্ধুকে কে প্রশ্ন করলে—আপনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন?

অধ্যাপক বন্ধুটি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—অনেক দিনের কথা হয়ে গেল বটে, কিন্তু আমি আজও ভুলি নি সে রাত্রের কথা। সে দৃশ্য আজও দেখছি চোখের সামনে। মাঝে মাঝে যেন দেখি। বিশ্বাস করা না করা অবিশ্যি আপনাদের ইচ্ছে। আমি কাউকে বলিও নে বিশ্বাস করতে।

আমি বললাম—সিদ্ধি খেয়েছিলেন বন্ধুর বাড়ি বেলঘরেতে? বা—

—আমি ওসব ছুঁতাম না তখন, এখনও তাই। বিশ্বাস করুন এ কথাটা—

সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম। আমরা বললাম—তারপর? বন্ধু বলতে আরম্ভ করলেন আবার ঃ

তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে। আমার মনে হল আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিংবা আমার কোন শক্ত রোগ হয়েছে। যা দেখছি এসব কী? বেশ মনে আছে পশ্চিম দিকের পাঁচিলের গায়ে একটা তাল কি নারকেল গাছ ছিল। চাঁদ তখন গাছটার ঝাঁকড়া মাথার ঠিক আড়ালে। সে ছবিটা বেশ মনে আছে আমার। আবার তখনই চোখ নামিয়ে পুকুরের দিকে চাইলাম—সেখানে সেই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অস্বাভাবিক দৃশ্য! সব সাদা সাদা বড় মর্মর মূর্তিগুলো জীবন্তের মত জলকেলি করছে পুকুরের জলে। আমার মাথা ঘুরে গেল যেন। নিজের ওপর কেমন একটা অবিশ্বাস

হল। সেখান থেকে মারলাম টেনে ছুট—একেবারে সোজা দৌড় দিয়ে ফটকের কাছে এসে যখন পৌঁছেছি তখন আমার মনে হল—অবিশ্যি হলপ করে বলতে পারব না সত্যি কি না—তবে আমার মনে হল, যেন অনেকগুলো মেয়ে খিলখিল করে একযোগে হেসে উঠল। হাসির একটি ঢেউ যেন আমার কানে এসে পৌঁছল। পরক্ষণেই আমি একেবারে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপরে এসে পড়লাম।

এবার আপনারা যে প্রশ্ন করবেন তা আমি জানি। সেখানে আর আমি গিয়েছিলাম কিনা? পরদিনই গিয়েছিলাম, একা নয়, তিনটি বন্ধু সঙ্গে করে। গিয়ে দেখলাম, পুরনো ভাঙা বাগানবাড়ি। আগাছার জঙ্গলে ভরা ফুলের ক্ষেত। কতকগুলো হাত-ভাঙা নাক-ভাঙ অপ্সরী পুতুল এদিকে ওদিকে বনে-জঙ্গলের আড়ালে পাথরের বেদীর ওপরে দাঁড় করানো। কোথাও কোনদিকে অস্বাভাবিকতার কোন চিহ্ন নেই।

হঠাৎ আমার এক বন্ধু আমাকে ডাক দিলে। ঘাটের ওপরে আমলকিতলায় যে হাত-ভাঙা পুতুলটা দাঁড়িয়ে আছে, একটা মোটা বিছুটিলতা মাটি থেকে গজিয়ে উঠে সেটার দুখানা পা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে—অন্তত এক বছরের পুরনো লতা। গত বর্ষায় এ বিছুটিলতা গজিয়ে উঠেছিল এমনও মনে হয়।

লতাটার কোথাও ছেঁড়া নেই, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল।

অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি এ পুতুলটাও কাল জলে নেমেছিল, অন্তত এ বেদিকা আমি কাল খালি দেখেছি। এই ঘাটের ধারেই তো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বন্ধুরা বললেন—তাহলে বিছুটিলতাটা এমন থাকে কী করে? এই জড়ানো তো এক বছরের জড়ানো। রাতারাতি গাছটা গজায়নি!

ওদের যুক্তি অকাট্য।

কী উত্তর দেব ওদের?? আমার নিজেরই যখন ক্রমশ অবিশ্বাস হচ্ছে আমার নিজের ওপর!

অশরীরী

নানারকম অদ্ভুত গল্প হচ্ছিল সেদিন আমাদের লিচুতলার আড্ডায়। কিন্তু সে সব নিতান্ত পানশে গোছের ভূতের গল্প। পাড়াগাঁয়ের বাঁশবাগানের আমবাগানের গেঁয়ো ভূত। সাদা কাপড় পরে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকে—ওসব অনেক শোনা আছে। ওর বেশি আর কেউ কিছু বলতে পারলে না।

এমন সময় শরৎ চক্রবর্তী আড্ডায় ঢুকলেন। তিনি আবগারী বিভাগে বহুদিন কাজ করে অবসর গ্রহণ করেছেন। ষাটের কাছাকাছি বয়সে। তান্ত্রিক সাধনা করেন। ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিনা পয়সায় ক'রে দেন। কোন রত্নের আংটি ধারণ করলে কার সুবিধে হবে, ঠিক ক'রে দেন। পরের বেগার খাটতে ওঁর জুড়ি বড় একটা দেখা যাবে না এসব কাজে। লোক অতি সজ্জন, সকলে মানে, শ্রাদ্ধা করে। অনেকে ওঁর সামনে ধূমপান করে না।

শরৎবাবু ঢুকে বললেন—এই যে, কি হচ্ছে আজ? যে বাদলা নেমেচে!

শ্যামাপদ মোক্তার বললেন—আসুন, আসুন চক্কত্তিমশায়। আমাদের ভূতের গল্প হচ্ছে বাদলার দিনে। তবে তেমন জমচে না। আপনার তো...

শরৎ চক্রবর্তীমশায় বললেন—আমি একটা গল্প বলতে পারি তবে সেটা ভূতের গল্প নয়। সেটা কিসের গল্প তা আমি জানিনে। আপনারা শুনে বিচার করুন।

শরৎবাবুর মুখে, সেই গল্প শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। স্বর্গমর্ত্য যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল সেই ঘন বর্ষার বর্ষণমুখর মেঘের আবরণ ভেদ করে।

শরৎবাবু বললেন—আমাকে সেবার হঠাৎ জলপাইগুড়ির ওধারে ডুয়ার্স অঞ্চলে বদলি করলে। আমার পরিবারবর্গ তখন ঢাকায়, তাদের ওখানে রেখে জলপাইগুড়ি চলে গেলাম। নতুন জায়গা। সেখানে নিজে না দেখেশুনে কি করে সবাইকে নিয়ে যাই। বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়েরা তখন ঢাকা স্কুলে পড়াশোনা করচে।

যেখানে গেলাম সেখানটা জলপাইগুড়ি থেকে অনেক দূর। ছোট লাইনে যেতে হয়, পথে চা-বাগান পড়ে। বনময় অঞ্চল। কিন্তু দূরে সবুজ বনরেখার পটভূমিকায় হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরমালা চোখে পড়ে। বড় নির্জন স্থান। আমি যে জায়গায় গেলাম, তার নাম হলদিয়া। ছোট্ট জায়গা, আমি সেখানে গিয়ে সিনিয়র সাব্‌ইন্‌স্পেক্টরের বাসায় উঠলাম, কারণ, আমার বাসা তখনো ঠিক হয়নি। সে ভদ্রলোকের নাম, রেবতীমোহন মুখুজ্যে, বাড়ি নদীয়া জেলা। বেশ ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। আমায় খুব যত্ন করলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই বাসা ঠিক ক'রে দেবেন ভরসা দিলেন।

তৃতীয় দিন সকালে আমায় বললেন—আপনাকে একটা কথা বলি.....

—কি?

—আপনার এখন এখানে আসা খুব ভুল হয়েচে।

—কেন বলুন তো?

—আপনি জানেন না কিছু এদেশের ব্যাপার?

—না। কি ব্যাপার?

—এই বর্ষাকালে এখানে ভয়ানক ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হচ্চে চারিধারে। আপনি নতুন লোক, আপনার তো খুবই জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। দু'একবার জ্বর হোলেই ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর দেখা দেবে। তখন জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এইরকম এদেশের কাণ্ড।

—তবে আপনারা আছেন কি করে?

—সেকথা আর ব'লে লাভ নেই। ইচ্ছে ক'রে নেই। আছি প'ড়ে পেটের দায়ে। চাকরি ছেড়ে দিলে এ বয়সে যাবো কোথায়, খাবো কি? আমার দুটি মেয়ে পর পর মারা গিয়েচে ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারে। তবুও বদলি পেলাম না। কি করি বলুন শরৎবাবু।

—তবেই তো...

—একটু সাবধানে থাকলেই হবে। জলটা গরম না ক'রে খাবেন না বাইরে গিয়ে!

—ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার হোলেই কি মানুষ মারা যায়?

—ভালো চিকিৎসা না হলে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষ ক'রে এই বর্ষাকালে যাঁরা নতুন আসেন, তাঁদের ধরলে বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আমি এরকম দুটো কেস দেখেচি। দুটোই মারা গেল।

শুনে মনে ভয় হলো। কিন্তু সাবধান হয়েই বা কি করবো। বিদেশে বেরিয়ে কত-দূর সাবধান হওয়াই বা চলে। যা থাকে কপালে ভেবে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলাম। দশ-বারো মাইল দূরে দূরে গাঁজার দোকান মদের দোকান তদারক করে বেড়াতে লাগলাম।

খুব ভালই লাগছিল। বর্ষার সবুজ অভিযান সুরু হয়েচে বনে বনে। কত রকমের ফুল ফোটে। কত ধরনের পাখী ডাকে। দূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত কি একটা শৃঙ্গ একদিন দেখা গেল। মিছরির মত ঝক্‌ঝক্‌ করচে সকালের সূর্যকিরণে। তবে রোদ বড় একটা উঠতে ইদানীং আর বড় দেখা যেতো না।

ইতিমধ্যে রেবতীবাবুর চেষ্টায় ভালো একটা বাসা পাওয়া গেল। উঁচু কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে তার ওপর বাংলো ধরনের ঘর করা হয়েছে। কাঠের মেজে বেশ শুকনো খট্‌খটে। ঘরটা বেশ বড়। আলো-হাওয়া বেশ আসে।

মনের ভয় ক্রমে কেটে গেল। তখন মনে ভাবি, রেবতীবাবুর ওটা উচিত হয়নি। এখানকার মাটিতে পা দিতে না দিতে অমন ভয় দেখিয়ে দেওয়া কি ভালো হয়েচে? কেন করলেন ওটা রেবতীবাবু? অন্য কোন মতলব ছিল নাকি? সাত-পাঁচ ভাবি।

এখানে আমার এক ব্রাহ্মণ আরদালি জুটলো। নাম দিগম্বর পাণ্ডে। লোকটা অনেক-দিন সেখানে আছে। রান্না করতো খুব ভালো। সে হাট-বাজার রান্নাবান্না সবই করতো। কোন অসুবিধা ছিল না।

মাস-দুই পরে সেবার 'বামনাপাড়া নর্থ' বলে একটা জায়গায় আবগারি তদারকে গেলাম। সেটা একটা চা-বাগানের পাশে ছোট্ট বাজার। চা-বাগানটার ট্রাকগুলোর গায়ে লেখা আছে, 'বামনাপাড়া নর্থ টি এস্টেট'। পাহাড়ী একটা ছোট নদী পেরিয়ে আমার

গরুর গাড়ি বাজারে গিয়ে থামলো। বেলা তখন দশটা। দুটি মাড়োয়ারী মহাজনের গদি আছে। তারা বন অঞ্চলের উৎপন্ন সওদা করে। দেবেন সামন্ত ব'লে মেদিনীপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাঠের কারবার আছে। গাঁজা ও আফিমের দোকান সেই দেবেন সামন্তের ভাই, শশী সামন্তের।

ওখানে বসে থাকতে-থাকতেই আমার শরীর কেমন খারাপ হোলো। মাথা ধরলো। দেবেন সামন্তকে বলতে সে কি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলে। বললে, এতেই সেরে যাবে। কোনো ভয় নেই।

আমি বললাম—আপনাদের এখানে ব্ল্যাকওয়াটার হয়?

—খুব।

—মানুষ মরে?

—তা মন্দ মরে না।

—আপনারা ভয় পান না?

—আমরা অনেকদিন আছি। নতুন যাঁরা আসেন, তাঁদের ভয় একটু বেশি।

সবাই দেখছি একই কথা বলে। গাঁজার হিসেব চেক করতে করতে আর যেন বসতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ি। জল-তেষ্টা পাওয়াতে বামনপাড়া নর্থ চা-বাগানের একটা গুমটি টিনের শেড্ থেকে জল চেয়ে খাই এক নেপালী দরওয়ানের কাছ থেকে।

যখন বাসায় পেঁছলাম তখন বেলা গিয়েচে। আমার তখন খুব জ্বর। পথেই কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। খবর পেয়ে রেবতীবাবু ছুটে এলেন। ডাক্তার ডাকা হলো। ওষুধ ও ইন্জেকসান চললো। তিনদিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল।

দিন পনেরো বেশ আছি।

সবাই বল্লে—ঠাণ্ডা লেগে অমনটা হঠাৎ হয়েছিল। ও কিছু না।

আমিও নিজেকে সেইভাবেই বোঝালুম। আবার বেশ কাজকর্ম করি। শরীরে কোন গ্লানি নেই। একদিন হলদিয়া পুলিশ-থানায় বসে থানার দারোগার সঙ্গে গল্প করচি, হঠাৎ আবার জ্বর এলো। দারোগাবাবু লোক দিয়ে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

আরদালি দিগম্বর পাঁড়েকে বললাম—জল দাও। জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম, তিনদিন ভীষণ জ্বরের ঘোরে কাটলো। রেবতীবাবু এবং থানার দারোগাবাবু দু'বেলাই আসতেন। কিভাবে আমার সাবু বার্লি তৈরী করতে হবে, আমার আরদালিকে শিখিয়ে দিয়ে যেতেন। তিনদিন পরে জ্বর কমে গেল।

ক্রমে বেশ সেরে উঠলাম। কাজকর্ম আবার সুরু ক'রে দিলাম। দিন পনেরো পরে চা-বাগানের একটা আবগারী কেস দেখতে গিয়েছি, আবার হঠাৎ জ্বর এলো। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম।

এখানকার জ্বর ভেল্কিবাজীর মত আসে, আবার ভেল্কিবাজীর মত চলে যায়। সুতরাং প্রথম প্রথম জ্বর এলে আমার যে রকম ভয় হোতো, এখন গা সওয়ার দরুন সে ভয় একেবারেই নেই। আরদালিকে ডেকে বলে দিলাম, আগের মত পথ্য প্রস্তুত ক'রে আমাকে যেন খাওয়ায়।

এবার কিন্তু একটু অন্যরকম হলো।

তত সহজে এবার আমি নিষ্কৃতি পেলাম না। দিন দুই পরে উৎকট ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরের সব লক্ষণগুলি আমার মধ্যে ফুটে বেরুলো। অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লাম। সেরে উঠতে পাঁচ-ছ'দিন লেগে গেল। দিন দুই পথ্য করার পর একদিন সকালবেলা আমার সঙ্গে রেবতীবাবু আর দারোগাবাবু দেখা করতে এলেন। আরদালিকে চা ক'রে দিতে বললাম, কিন্তু তাঁরা চা খেলেন না। পরে বুঝেছিলাম, তাঁরা চা খাননি—ব্ল্যাকওয়াটারকে ছোঁয়াচে জ্বর ভেবেই। দারোগাবাবু বললেন—শরৎবাবু, একটা কথা বলি।

—বলুন।

—আপনি এখান থেকে চলে যান।

—কেন বলুন তো?

—ডাক্তারবাবুর তাই মত।

—আমাকে তো কিছু বলেননি।

দারোগাবাবু ইতস্তত ক'রে বললেন—না, আপনাকে বলেননি। আমাদের বলেচেন আপনাকে বলবার জন্য কিনা। তাই বলা উচিত ভাবলাম। উনি বলেচেন, আপনার অসুখ খুব খারাপ। মানে—

—আমি তো সেরে গিয়েচি।

—ও সারা বড় কঠিন শরৎবাবু।

—বেশ, তাহলে স্টেশন পর্যন্ত আমি যাবো কি করে? রক্ষিয়াঘাট পার হবার তো কোন উপায় দেখিনি।

—কিছু ভাববেন না। স্ট্রেচার যোগাড় করছি চা-বাগান থেকে। কুলী পাঠাবো। পুলিশের একজন লোক সাথী থাকবে, আপনাকে ট্রেনে উঠিয়ে না দিয়ে তারা ফিরবে না।

—বেশ।

আমি তখন জানতাম না যে, আজই আমার জীবনের শেষদিন হোতো, যদি—

কিন্তু সে কথা ক্রমে বলচি।

আমি সম্মতি দিলে দারোগাবাবু চলে গেলেন।

তখন বেলা ন'টা হবে। গরম জল ক'রে নিয়ে আসতে বললাম আরদালিকে, গা-হাত মুছবো ব'লে। তারপর একবাটি বার্লি খেলাম। আরও একটু বেলা হোলে দুটি ভাতও খেলাম।

বেলা বারোটার পর লোকজন এলো স্ট্রেচার নিয়ে। এই পর্যন্ত ব'লে শরৎ চক্রবর্তী বললেন—একটু চা খাবার ইচ্ছে হচ্চে।

আমরা বললাম—গল্পটা শেষ করুন।

—চা খেয়ে নিয়ে বলবো। এইবার গল্পের আসল অংশটাতে এসে গিয়েছি কিনা, একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলি।

নিতাইবাবু উকিল বললেন—একই কথা। আপনি বললেন, ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর হলো, সেরে গিয়ে আপনি পথ্য করলেন, অথচ ডাক্তারবাবু কেন আপনার অসুখ খারাপ বললেন? অসুখ তো সেরে গিয়েছিল।

—সেরে গিয়েছিল কি রকম সেবার, এখুনি সেটা শুনলে বুঝতে পারবেন। আসলে সারেনি।

—তবে পথ্য দিয়েছিল কেন ডাক্তার?

—এ কথার জবাব আমি দিতে পারবো না। কাউকে জিগ্যেসও করিনি। তবে যেমন ঘটেছিল, সেইরকম বলে যাচ্চি—

—এটা একটা অদ্ভুত কথা বলচেন আপনি। কিরকম সে-দেশের ডাক্তার বুঝলাম না মশাই!

—এ-কথাটা আমিও কখনো ভেবে দেখিনি। আচ্ছা, এবার বলি গল্প। শরৎ চক্রবর্তী পুনরায় গল্প আরম্ভ করলেনঃ

বেলা বারোটার পর স্ট্রেচার নিয়ে এলো চা-বাগানের লোকজন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেবতীবাবু ও দারোগাবাবু। আমি আরদালি জিনিসপত্র গোছাচ্চি এমন সময় আমার এলো জ্বর। ভীষণ কম্পজ্বর। আর আমি বসতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধা বিছানা আরদালিকে দিয়ে খুলিয়ে পাতিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার আমি আর কিছুই জানিনে। আমার সমস্ত চৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেল এক ঘন অন্ধকারের আবরণের অন্তরালে।

যখন আবার আমার জ্ঞান হলো, তখন দুটো জিনিস আমার চোখে পড়লো প্রথমেই। অন্ধকারের মধ্যে একটা কি গাছের ডাল পাশের জানালার বাইরে হাওয়ায় দুলচে। দ্বিতীয় জিনিস হলো, আমার বাক্স ও পুটুলি আমার পায়ের দিকে দেওয়ালের কাছে রয়েচে এবং আমার ছাতিটা দেওয়ালের কোণে হেলানো রয়েচে।

আমি কি রেলওয়ে ট্রেনে উঠেছি?...

কিন্তু এত অন্ধকার কেন রেলের কামরা? অন্য লোকই বা নেই কেন কামরায়? তারপর আস্তে আস্তে আমার মনের আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে আসতে লাগলো। আমার মনে পড়লো যে, আমি স্ট্রেচারে আদৌ উঠিনি, জ্বর আসাতে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু ঘরই যদি হয় আরদালি দিগম্বর কই? ঘরে আলো জ্বালেনি? আমি কোথায়?

তৃষ্ণা পেয়েছিল। ডাকতে গেলাম ওকে। গলায় স্বর আটকে গেল। দুবার ডাকতে গেলাম, দুবারই তাই হলো।

আমার মনে হোলো বাইরে চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের সামান্য আলো এসে পড়েচে। কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে রইলাম, ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোন শব্দও নেই।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো বাইরের দিকে। কে ওখানে বাইরে?

এই দেখুন, এতদিন পরে মনে পড়েও আমার গা শিউরে উঠলো। দেখলাম কি জানেন, একটি কালো মত মেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমার ঘরের চারিপাশে ঘুরছে, আর একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে কি করচে—দুবার আমার সামনের দরজার ফাঁক দিয়ে সে নীচু হয়ে ঘুরে গেল।... তিনবারের বার মেয়েটি হঠাৎ মুখ উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললে—কোনো ভয় নেই—গণ্ডি দিচ্চি—আজ রাত্রে কেউ গণ্ডির মধ্যে আসতে পারবে না—ঘুমো—

অতি অল্পক্ষণের জন্যে মেয়েটিকে চোখের সামনে দেখলাম, তারপর সে ঘুরে গেল ওদিকে। আমারও আর জ্ঞান রইল না। ঘুমিয়ে পড়লাম কি?

এরপরে কতক্ষণ পরে জেগে উঠেছিলাম তা বলতে পারবো না, কিন্তু তখন চোখ খুলেই দেখলাম, সেই কালো মেয়েটি আমার শিয়রের কাছে ব'সে। তার বয়েস আঠারো বছরের বেশি হবে বলে আমার মনে হলো না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম. মেয়েটি যেন খুব ঘেমেচে, ওর মুখ ঘামে ভিজে গিয়েচে যেন, সারা শরীর দিয়ে যেন দরদর করে ঘাম ঝরচে...

আমি ওর দিকে চেয়ে দেখতেই মেয়েটি চমৎকার শান্ত স্নেহময় সুরে বলে উঠলো—জাগলি কেন? ঘুমো-ঘুমো—কোনো ভয় নেই—ঘুমো—

শেষবার যখন ও 'ঘুমো' বলেছে, তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ওর কথা শুনতে শুনতে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে সেই গাছের ডালটার দিকে নজর পড়লো জানলার বাইরে। তার গায়ে জ্যোৎস্না পড়েচে।...

এইখানেই আমার গল্প শেষ হলো।

সকালে আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন আমার মনে হোলো, স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ঘুম থেকে আমি জেগে উঠেছি।

আমার শরীরে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না। ক্রমে ক্রমে একটু বেলা হোলো। তখন দেখি, দিগম্বর পাঁড়ে আরদালি সন্তর্পণে পা টিপে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্চে। আমি ডাকতেই যেন সে চমকে উঠলো. কোনো উত্তর দিলো না। আমি বললাম—রেবতীবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।

থতমত খেয়ে সে যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে অনেক লোক এলো আমাকে দেখতে। তার ম'ধ্য রেবতীবাবুও ছিলেন।

রেবতীবাবু বললেন—কেমন আছেন শরৎবাবু?

—ভালো। আমি কিছু খাবো।

তখনই রেবতীবাবু বাইরে গিয়ে কাকে কি বললেন। খানিক পরে এক বাটি বার্লি এলো আমার জন্যে। বার্লি খেয়ে শরীরে বল পেলাম। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন. জ্বর ছেড়ে গিয়েচে।

এর দিন-দুই পরে আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে উঠলাম। পথ্যও করলাম। তখন ক্রমে ক্রমে শুনলাম, সেই ভীষণ রাত্রে আমাকে মুমূর্ষু মনে ক'রে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল একা ফেলে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন রাত কাটবে না। এমন কি. নাকি সকালে

আমার সৎকারের জন্যে কে কে যাবে, কোথায় কাঠ পাওয়া যাবে, এসব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সকালেই লোক পাঠিয়ে আমার পরিবারবর্গকে টেলিগ্রামে আমার মৃত্যু সংবাদ জানানোর জন্যে থানা থেকে একজন কনেস্টেবল পাঠাবেন, দারোগাবাবু তাও ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

অথচ সেই নির্বান্ধব, পরিত্যক্ত অবস্থায় কে আমার মৃত্যুশয্যার পাশে সারারাত বসেছিল, কে আমার ঘরের চারিধারে গণ্ডি এঁকে দিয়েছিল আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে...সবাই পরিত্যাগ করলেও কে আমাকে সেই অসহায় অবস্থার মধ্যেও পাহারা দিয়েছিল...এ সব প্রশ্নের কোনো জবাবই আমি দিতে পারবো না।

যদি আপনারা বলেন, সবটাই জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি—তারও কোন প্রতিবাদ আমি করতে চাই না। স্বপ্ন যদি হয়, বড় মধুর, বড় উন্নত ধরনের উদার স্বপ্ন দেখেছিল আমার মুমূর্ষু মন। সে স্বপ্নের ঘোর আমার সারাজীবন চোখে রইল মাখা। মস্ত বড় একটা আশার বাণী দিয়ে গেল প্রাণে।

শরৎ চক্রবর্তী চুপ করলেন। মনে হোলো তাঁর চোখে যেন জল চক্‌চক্‌ করছে। উকিল নিতাইপদ রাহা বললে—সেরে উঠে হলদিয়াতে আপনি ছিলেন কতদিন?

—যতদিন গবর্ণমেন্ট আমাকে বদলি না করেছিল? প্রায় দু'বছর।

—এভাবে একা ছিলেন বাসায়?

—আমি আর দিগম্বর। আর কেউ না।

—আর কোনোদিন কিছু দেখেছিলেন?

—না।

—আর অসুখে ভুগেছিলেন?

—না।

ঘন বর্ষার রাত। বাইরে বেশ অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছিল উঠানের শিউলি গাছটার ডালে পাতায়। আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। নিতাই উকিলও আর বেশী কথা বলেনি। বৃষ্টি এসে পড়বে ব'লে শরৎ চক্রবর্তীকে আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম ছাতি দিয়ে।

বাঘের মন্তর

বাইরে বেশ শীত সেদিন। রায়বাহাদুরের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বেশ গল্প জমেছিল। আমরা অনেকে ছিলাম। ঘন ঘন গরম চা ও ফুলুরি মুড়ি আসাতে আসর একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছিল।

রায়বাহাদুর অনুকুল মিত্র একজন মস্ত বড় শিকারী। আমরা কে তাঁর কথা না শুনেছি? তাঁর ঘর ঢুকে চারিদিকে চেয়ে শুধু দেখবে মরা বাঘ ও ভালুকের চামড়া, বাঘের মুখ ভালুকের মুখ বাঁধানো—ঘরগুলো দেখে মনে হয় ট্যাক্সিডারমিস্টের কারখানায় বুঝি এসে পড়লাম।

কিন্তু সেদিন আর-একজন লম্বা মত প্রৌঢ় ব্যক্তিকে রায়বাহাদুরের অতি কাছে বসে থাকতে দেখে ও শিকার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। রায়বাহাদুরের সামনে শিকারের কথা বলে এমন লোক তো আজও দেখিনি। যে অনুকুল মিত্র জীবনে ত্রিশটি রয়েল বেঙ্গল পনেরোটি লেপার্ড মেরেছেন, ভালুক ও বুনো শুয়োরের তো লেখা-জোখা নেই—এছাড়া আছে গণ্ডার, আছে বাইসন, আছে অজগর পাইথন, আছে শজারু, আছে কাক বক হাঁস, এ-হেন রায়বাহাদুরের পাশে বসে শিকারের কথা বলা! নাঃ, লোকটা কে হে? বড় কৌতূহল হল জানবার।

উপেনবাবু, আমাদের উপেন মাইতি আপন মনে চা খেয়েই চলেছেন, তাঁকে দেখে বললাম—ও উপেনবাবু, ঐ লোকটি কে?

উপেনবাবু যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—আঁ? কই, কে?